উপহার

বাংলার সুবক্তা কথাশিল্পী, পণপ্রথার বিরুদ্ধে বীর মুজাহিদ, পণলোভের অন্ধকারে দিশাহারা যুবসমাজের পথের দিশারী ‘দিশা’র প্রতিষ্ঠাতা পরম শ্রদ্ধেয় -

মওলানা হায়দার আলী সাহেবের করকমলে।

তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিনহু স্বা-লিহাল আ’মাল।

বিনা পণের বউ

(সামাজিক উপন্যাস)

আব্দুল হামীদ

সূত্রপাত

এই লেখাটি ১৯৮১ সালের। আমি তখন মহিষাডহরী মাদ্রাসার মিশকাতের ছাত্র। তখন আমার কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোকিত তারুণ্য, ইসলামের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত আবেগময় ‘রোমান্টিক’ মন। ইসলামের আলোকে সুখময় শুভ দাম্পত্যে আগ্রহী, ইসলামের পরাজয়ে মন বিষণ্ন হয়, মুসলিমদের দুরবস্থা দেখে মন কাঁদে, মুসলিম রমণীদের অবস্থা দর্শনে প্রাণ ফেটে যায়। এই আবেগে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে লেখা এই গল্পটি। সংকীর্ণ রুমের ভিতরে রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে যেত, তখন হ্যারিকেনের বাতি খাটিয়ে শিথানে নিয়ে শুয়ে শুয়ে একটু একটু করে লিখতাম।

এই লেখা বন্ধু-মহলে প্রকাশ হলে তারা আমাকে উৎসাহিত করে। ছাপার জন্যও চেষ্টা করে অনেকে। কিন্তু কাঁচা হাতের লেখা কে আর ছাপবে?

সুতরাং কালের কালো অন্ধকারে তা চাপা পড়ে যায়। বর্তমানে কিছু বন্ধুর আগ্রহে নতুনভাবে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হই।

ঘটনা যদিও কাল্পনিক, তবুও বাস্তব। সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছি ‘বিনা পণের বউ’-এর মাধ্যমে। আশা করি শিক্ষার দিকটাই গ্রহণ করবেন জ্ঞানিগণ।

বইটি পড়ার পর আল্লাহ যদি কোন বর বা বরের বাবাকে সুমতি দেন এবং বরপণ বা যৌতুক নেওয়ার সঙ্কল্প বর্জন করেন, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

আব্দুল হামীদ

মা-বোন তোমার ভাসিতেছে ঐ
বহিতেছে নদী-জলে,
স্বার্থ ত্যাগিয়া বাঁচাও তাদের
আপনার বাহুবলে।
হতাহত তব পণ-খঞ্জরে
নিপীড়িত পণ-আর্ততায়,
কেন এ স্বার্থ, কিসের লাগিয়া
ফিরিছে তাহারা ব্যর্থতায়।

মহিষাডহরী
২০/৮/৮১ইং

(১)

সমস্ত দিনটা সংসারের কাজে কাটিয়ে বদরুন্নিসা মাগরেবের নামায পড়ছিল। সংসারের কর্ত্রী বলতে সে-ই। মাতা পরলোক গমন করেছে প্রায় তিন বছর হল। এখন পিতা ও বৃদ্ধ পিতামহ ব্যতীত তার এ সংসারে আর কেউ নেই। সেই মাতৃবিয়োগিনী কন্যা মাতার জন্য প্রতি নামাযে প্রার্থনা করে। সকাতরে মহান করুণানিধানের নিকট নিজ সংসারের কল্যাণ ভিক্ষা করে। মাতা যখন মারা যায়, তার বয়স তখন বারো বছর। তার মনে পড়ে যায় সবকিছুই; সেই হাসপাতালে মায়ের শিয়রে বসে অশ্রুবিসর্জন করে দিনরাত করা। কখনো মন-প্রাণ দিয়ে মায়ের শুশ্রূষা করেছে, আবার কখনো তাঁর অবস্থা একটু খারাপ দেখে কেঁদে বুকের উপর মাথা রেখে কত ভাবনা ভেবেছে! সেই সব কথাগুলো মনে পড়লে তার হৃদয় যেন 'হু-হু' করে জ্বলে ওঠে। মাতার মৃত্যুশয্যায় শয়নাবস্থা, তাকে সমাধিস্থ করার জন্য গ্রামবাসীর শবযাত্রা এবং পিতা-পিতামহের তখনকার সেই আকুল মুখশ্রী তার স্মৃতিপটে জেগে উঠলে সে দগ্ধে দগ্ধে জ্বালা অনুভব করে।

নামাযান্তে ঠিক সেই সমস্ত কথাই মনে জাগিয়ে মাতৃবাৎসল্য-হারা নিরাশার মাঝে কোন গুপ্ত অভিলাষ ব্যক্ত করছিল ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল আর্তনাদ শ্রবণকারীর নিকটে। হঠাৎ সে অধৈর্য হয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। অন্তর ফেটে তার চক্ষুতে নেমে এল এক প্রস্রবণ-ধারা। এমনি সময়ে বাহির হতে ডাক এল, 'বদরু---?'

ডুকরে কান্না পিতার কর্ণগোচর হয়েছে বুঝে বদরু লজ্জিতা হল। বিদ্যুৎ-বেগে মুসাল্লা তুলে আঁচলে চক্ষু মুছতে মুছতে সাড়া দিল, 'যাই আব্বা!'

পিতা বলল, 'আয় মা! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি খেতে দিয়ে যা।'

দুহিতার দুঃখ-জ্বালা অনুমান করে তারও চোখে-মুখে ব্যথার ছায়া প্রকাশিত হল। তা দর্শন করে বদরুর চক্ষু হতে গন্ড বেয়ে আবার দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। পিতা সারাটা দিন দিনেশ-আতপে পরের ক্ষেতে খেটে এই সন্ধ্যার সময় পরিশ্রান্ত দেহে বাড়ি ফিরেছে। আহা! কত কষ্টই না পেয়েছে! সেই উত্তপ্ত ধুধু মাঠের সুদূর প্রান্তের রৌদ্র-বাতাস কিভাবে সে সহ্য করেছে! সে সব কথা মনে করতে বদরুর মনোব্যথা আরো নিবিড় হয়ে এল। চাপা কান্না কাঁদতে কাঁদতে পিতা-পিতামহের খাবার আনতে অন্য কক্ষে প্রবেশ করল। যত ভাত বাড়ে, অশ্রুধারা ততই বেড়ে চলে। এ ধারা যেন এতদিন তার বুকে বরফের মত জমে ছিল। আজ অকস্মাৎ কিসের তাপে সে বরফ গলে অশ্রুনীর হয়ে চক্ষুকে স্রোতস্বিনীর মত করে তুলল।

বেদনাহতা কন্যার বিগলিত অশ্রু দেখে পিতার চক্ষু হতেও গড়িয়ে এল শোকাশ্রু। সে পূর্বের সুখের সংসার মনে করতে লাগল। যত জমি-জায়গা ছিল তার কিছু ঐ স্বার্থপর সূদখোর বড়লোকদের নিকট কিছু টাকার ঋণী হয়ে অন্য এক বড়লোকের কাছে বন্ধক রেখে সূদে-আসলে টাকা পরিশোধ করেছিল। জমি ছাড়াতেও জমি বিক্রি করতে হল। সংসারের কোন কাজে এক পয়সাও ব্যয় করতে পারেনি। এমনি করে স্ত্রীর অসুখেও কত টাকা ব্যয় হয়ে গেল, তার দায়েও কিছু জমি উড়ে গেল। সে সংসারের সুখের প্রদীপ কোন্ ঝড়ো হাওয়ায় যে নিভে গেল, তা সে দেখেও দেখতে পেল না। আবার বাকি যে জমি যেটুকু বর্তমান আছে সেটুকুও 'যাব যাব' করছে। পরের দিন-মজুরী খেটে যে দু-চার পয়সা উপার্জন করে আনে তা তার সংসারের নানা কাজে ব্যয় হয়। কিভাবে দিন চলবে, কেমন করে পিতা-কন্যার ভরণ-পোষণ করবে, সে সব চিন্তার মাঝে হঠাৎ তার আর এক চিন্তা তার মনের আকাশে জ্বলন্ত দিবাকরের মত উদিত হয়ে তাকে দগ্ধীভূত করে তুলল। পূর্বে যে সব চিন্তা মনে এসেছে তা কোন রকম সুখে-দুঃখে এড়িয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এ মহা দুশ্চিন্তার মূলকে সে কেমন করে তার মনের জমি হতে নির্মূল করবে এবং যে অসাধ্য সাধন করার পর্যায় এসে পড়েছে তাই বা কেমন করে সাধবে? এই সব দুশ্চিন্তার মর্মান্তিক বেদনায় তার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে লাগল। পিতা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে পুত্রকে সাত-পাঁচ বুঝিয়ে বলল, 'ভাবনার কিছু নেই বাবা! আল্লাহ আছেন। অসহায়দের সহায় তিনি। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে।'

বদরুন্নিসা পিতাপিতামহের সম্মুখে ভাত রেখে পুনরায় নিজ কক্ষে প্রবেশ করল। পিতামহ হাঁক দিল, 'বদরু! তুই ভাত খাবি না?'

দূর হতেই বদরু উত্তর দিল, 'না। আজ কিছু খাব না।'

পিতা বলল, 'কেন, কি হল মা? আয় আমাদের সাথেই একমুঠো খেয়ে নে।'

তারপর উঠে গিয়ে বদরুকে সস্নেহে ধরে এনে কাছে বসিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় বলল, 'ভাত খাবি না কেন মা?'

বদরু এবার ফুঁপিয়ে উঠল। উত্তর খুঁজে না পেয়ে মুখ নিচু করে চক্ষু মুছল। পিতামহ অশ্রুমুখীর দিকে দৃক্পাত করে বলল, 'ছিঃ! কান্না কেন মা? এতবড় মেয়ে হয়েছিস, জ্ঞান হয়েছে। আবার কাঁদা সাজে?'

বদরু মুখ খুলল; বলল, 'এত বড় হয়েছি বলেই তো কাঁদছি দাদা; ছোটবেলায় কেন কাঁদিনি? জ্ঞান হয়েছে বলেই আজ আমি সব বুঝতে পারছি যে, আমার আব্বা-দাদার কেউ নেই। তারা সারাদিন মেহনত করে সন্ধ্যার সময় এত দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘর ঢোকে। সেসব ভেবে মন কি করে ভালো থাকে?'

পিতা কন্যার বেদনবাক্য শুনে স্তম্ভিত হল। কত দুঃখ-জ্বালা তাকে নিষ্পেষিত করে তা অনুভব করে অবাক হয়ে গেল। পরক্ষণে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'সে চিন্তা তোর করে লাভ কি?

আমাদের কষ্ট হয়, আমরা বুঝব। তোর এত চিন্তা করে মনকে দগ্ধানো কেন?’

কিন্তু কথাগুলি বলতে বলতে তারও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হল। চিন্তাক্লিষ্ট দারিদ্র্য-পীড়িত এই তিনটি মানুষের খাদ্য-পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জনের সাথে তাদের অশ্রুবিন্দু মিশে যেতে লাগল। পিতা অতি কষ্টে তা সংবরণ করে সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে পাত্রের দিকে ইঙ্গিত করে খেতে বলল। তারপর গামছা দ্বারা বদরুর চোখের পানি মুছে দিয়ে ভোজনের জন্য ঝুঁকে পড়ল।

পিতামহ বলল, ‘আমরা যা করি না করি, সে বিষয়ের ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না মা! নামায-রোযা করে আমাদের সুখ-শান্তি দুনিয়াতে হোক বা না হোক, তা আল্লাহর ইচ্ছা। কিন্তু পরকালে আরাম-আয়েশ পাব কি না সেই চিন্তাই কর। নে ভাত খা।’

তখনও বদরুর নয়ন-নির্ঝর থামেনি। কিন্তু পরক্ষণে সে বুঝল যে, সারাদিন ক্লান্ত হয়ে দুটি খেয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সময়ে সে শুধু শুধু শোক উথলে তাদেরকে কেন বিরক্ত করছে? তাই ক্ষান্ত হয়ে একবার আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খেতে মনোযোগী হল।

কিন্তু সে খাওয়াতে কি স্বাদ আছে? কোন রকম মুখে তুললে, পেটকে যে আর যেতেই চায় না। পাত্রের ভাত যেন পাত্রতেই ফিরে আসতে চায়। বদরু কিঞ্চিৎ ভাত নাকে-মুখে গুঁজে নিয়ে হাত গুটিয়ে উদাস হয়ে বসে রইল। শত আদেশ ও অনুরোধে আর একটি ভাতও মুখে তুলল না।

(২)

- কে আপনি, এখানে কেন?

- আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমাদের এক আত্মীয়। তবে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা বা যাওয়া-আসা নেই বলেই এতটা দূরে সরে আছি। আর কথায় বলে, ‘মানুষের কুটুম এলে-গেলে, পশুর কুটুম চাঁটলে-চুঁটলে।’ বিশেষ করে আব্বা বড় বিলাস-প্রিয়। তাছাড়া তোমরা একটু ---- মানে ---।

- মানে? থেমে গেলেন যে? বলুন। গরীব, তাই না? বেশ তো! পিতা গুণে পুত্র, আপনার কোন সূত্র? আপনারা বড়লোক তা তো বুঝতেই পারছি। তবে গরীবের বাড়িতে পদার্পণের অর্থ কি? কেন শুধু আস্ফালন?

- ক্ষতি কি? আমি কি গুন্ডা, না লম্পট?

- তা বলছি না। তবে আপনার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে অনুগ্রহপূর্বক সময়ে এলে কৃতজ্ঞ হব। অসময়ে আসাটা আমার কাছে অসমীচীন বলে মনে হয়।

- কারণ?

- কারণ আমি তরুণী একাকিনী। আমার বিশেষ ক্ষতি।

- কিন্তু আমি তো তোমার কোন ক্ষতি সাধন করতে আসিনি।

- সে কথা আমি কি করে বুঝব? তাছাড়া লোকে তো তা দেখবে না।

‘হুঁ। বুঝতে পেরেছি।’ বলে যুবক স্মিতমুখে বের হয়ে গেল বদরুর বাড়ি হতে। তরুণীর বাক্‌চাতুর্যে অপমানিত হলেও সহসা তা মন হতে দূর করে দিল। আর বদরুর সেই সুন্দর মুখশ্রীর ছবিখানি বক্ষের নিভৃত কোণে গুপ্ত রাখল।

যুবক চলে গেলে বদরুন্নিসা রান্না চড়িয়েছিল। হঠাৎ কোন্ এক অজানা দুশ্চিন্তা তার মনের দুয়ারে উঁকি দিতে লাগল। যুবকের নবাগমন তার মনে সংশয় সৃষ্টি করল। ভাবতে লাগল, কেন সে এসেছিল তাদের বাড়ি? আর সে এমন দুর্ব্যবহার করে চলে যেতেই বা কেন বলল? এত কথা না বললেই তো পারত। যদি আত্মীয় হয় তবে পিতার নিকট প্রকাশিত হলে সে কি উত্তর করবে তা খুঁজেও পেল না। শরমে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। কথায় কথায় সে শুনেছে পাশের গ্রামে তাদের দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয় আছে। তবে যদি তারাই হয় তবে কেন সে বোকার মত এতটা বাগ্‌বিতন্ডা করে নিজের লজ্জাকে নিজেই বাড়িয়ে তুলল? যদিও সরলমতীর মনের বিশ্বাস ছিল যে, মেয়ে হয়ে বেগানা কোন পুরুষকে প্রশ্রয় দিতে নেই।

সন্ধ্যার সময় পিতা বাড়ি ফিরলে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলে উঠল, ‘বদরু! আজ আমার খোঁজে কেউ এসেছিল কি?’

বদরু উত্তরে সংশয়াবিষ্ট কণ্ঠে বলল, ‘হ্যাঁ, একজন এসেছিল তো।

- তাকে কি বললি?

- বলার কি ছিল? বললাম, আব্বা-দাদা কেউ বাড়িতে নেই। সন্ধ্যাবেলায় আসবেন।

- হ্যাঁ মা! ঠিকই বলেছিস। কিন্তু বড় ভয় হয় মা! তারা বড় মানুষ; সামান্য দোষে রোষে ফেটে পড়বে। থাকতে বললেই ভালো হতো। আমার বলে যেতে খেয়াল ছিল না।

তারপর মনে মনে বলল, ‘সিয়ানা মেয়ে ঠিকই করেছে।’

বদরু উৎসুকা হয়ে পিতাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আব্বা! কি জন্যে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছে?’

একটু ইতস্ততঃ করে পিতা উত্তর দিল, ‘কি জানি? সেদিন রাস্তায় দেখা হলে বলল, চাচা! তোমাদের বাড়ি বেড়াতে যাব। তবে কি মনে করে সে গরীবের ঘর আসতে চেয়েছে তা আর কি ক’রে বলি মা!’

কিন্তু বদরু পিতার নিকট যথেষ্ট উত্তর না পেলেও সে তার মনকে জিজ্ঞাসা ক’রে সন্তোষজনক সঠিক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছিল।

বদরুদের বাড়ির ঠিক পিছন বেয়ে একটি রাস্তা আছে। শামসুল আলম প্রত্যহ সেই রাস্তা ধরে সাইকেলে কলেজ যাতায়াত করত। বদরুন্নিসা যেদিন বাড়ির মুক্ত বাতায়নে বসে উদাস মনে মাথার খোঁপা বাঁধছিল সেদিনেই শামসুল তাকে প্রথম দেখেছিল। একদিনের নিমেষ দর্শনে সে দৈনিক দর্শন-কামনায় সেই বাতায়নের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পথ অতিক্রম করত। আর এমনিভাবে চার চক্ষুর ক্ষণেক মিলনের মাঝে শামসুলের মনে-প্রাণে মহাকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে 'আপন' বলে পরিচয় পেলে আন্তরিকতা গাঢ় হয়ে উঠেছিল। তাই তো চাচার নিকট তাদের বাড়ি বেড়াতে যাবার জন্য আবদার জানিয়েছিল এবং গিয়েও ছিল।

কিন্তু শামসুল যখন বদরুর ভিতরে কোন প্রকার চাপল্য লক্ষ্য করল না, তখন সে নিজেকে নিরাশার অন্ধকারে ভাসিয়ে দিল না। সে মনে মনে স্থির করল, তাকে জানতে হবে, চিনতে হবে, জয় করতেই হবে তার মনকে। কারণ তার মনোহারিত্বের মায়া-রশি যে তার নবযৌবনের অনুসন্ধিৎসু মনকে পূর্ণরূপে বেঁধে ফেলেছে।

বদরুর (পূর্ণেন্দু) নামের সাথে তার চেহারার ছিল অপূর্ব মিল। কিন্তু যার রূপ আছে, তার শত্রু আছে, বাহারের প্রতি চোরা দৃষ্টি আছে, আছে কত সুযোগ-সন্ধানী উচ্ছৃঙ্খল মন-বিলাসীর অশুভ কামনা।

এ সব থেকে বাঁচা ততটা সহজ নয়; বিশেষ করে বদরুর অভাব-ভরা সংসারে। নারী হল মূল্যবান মানিক। তার ঔজ্জ্বল্য বিকাশের সময় নিরাপদ স্থান হওয়া জরুরী। তা তো নেই; উপরন্তু প্রায় প্রত্যেক দিনই বাড়িতে সে একাকিনী থাকে। এ সব চিন্তা করেও সে দিনের দিন রুগ্‌ণ হয়ে যাচ্ছে। আজও সেই ভাবনার সাথে রান্নাশালে রান্নায় ব্যস্ত ছিল। গতকাল যুবকের আগমনুদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল; ভাবল, আবার যদি আসে তবে তাকে কি বলবে? যদি আত্মীয়তার পরিচয় দেয় এবং নিজেও সতর্ক থাকে তবে লোকচক্ষুকে এড়ানো যাবে তো? অপবাদ আসবে না তো?

একবার ক'রে হাঁড়ি খুলে দেখে আর বাইরে বেণু-বনের উপর দৃষ্টিপাত করে মঙ্গলামঙ্গল কত কি ভাবে। ঠিক সেই অবসরে বের হতে কে যেন শুষ্ক গলা ঝেড়ে নিয়ে ডাক দিল, 'চাচা! বাড়িতে আছ।'

বদরু কান খাড়া করে শুনতেই দেখল, যুবক ত্রস্তপদে বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করছে। সে সত্বর প্রস্তুত হয়ে বসল। যুবক রান্নাশালের কাছাকাছি হয়ে মৃদু হাসির ভূমিকায় বদরুর উদ্দেশ্যে বলল, বদরু--!

বদরু চমৎকৃতা হল। ভাবল, যুবক তার নাম কিভাবে জানল? বুঝল, সে হয়তো পিতার নিকট থেকেই জেনেছে। তারপর উনুনের জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ডগুলোকে একটু উস্কিয়ে দিয়ে দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করল। লজ্জা ও দ্বিধা-সংকোচে সে কি উত্তর করবে তা খুঁজেও পেল না।

যুবক শামসুল বুঝল, সে লজ্জায় ইতস্ততঃ করছে। তার দিকে নিমেষের জন্য তাকিয়ে অবনত মস্তকে বলল, 'চাচা কোথায় বদরু?'

বদরুর বলার ইচ্ছা ছিল না। নিরুপায় হয়ে বলতে বাধ্য হল, 'মাঠে গেছে।'

কোকিল কণ্ঠের এই সামান্য মধুময় কথাতে শামসুলের হৃদয়-মন যেন নেচে উঠল। পুনরায় হাসিমাখা মুখে বলল, 'কখন ফিরবে জানো?'

বদরু সংক্ষেপে বলল, 'না।'

শামসুল ক্লান্তি প্রকাশ করে বদরুর নিকট এক গ্লাস পানি চাইল। বদরু এবারে যেন বিপদে পড়ল। সসংকোচে এক গ্লাস শরবত তৈরী করে শামসুলের সামনে নামিয়ে দিল। সে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পান করে মুচকি হাসি হেসে বলল, 'আমাকে চিনতে পারলে না বদরু?'

বদরু লজ্জায় রাঙা হয়ে শাড়ির অবগুণ্ঠন দৃঢ় করে পদ্মপলাশলোচনে বঙ্কিম দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ হেসে উত্তর দিল, 'হুঁ, পেরেছি।'

বলেই সে রান্নাশালে চলে গেল। তারপর দুজনেই নীরব রইল। কিয়ৎক্ষণ পর শামসুল এক গাল হাসি হেসে বলল, 'জানো বদরু, আমি তোমাদের ঘর কেন আসছি? হয়তো তুমি অনুমান করেই থাকবে। যাক্ তুমি এগুলো রেখে নাও।' -বলে কতকগুলি উপঢৌকন তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

বদরু এক নজর তাকিয়ে এবারে তাকে ভালো করেই মুখ খুলতে হল। দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'না-না, এসব আপনি কি করেছেন? আমরা গরীব মানুষ। আমাদের এ সব মানাবে না। তাছাড়া আমি একটা কথা বলি; আপনি রাগ করবেন না আশা করি। আপনি সম্পর্কে আমার ভাই হন। অতএব বোনের সর্বনাশ ঘটাতে এমনভাবে আর আসবেন না দয়া করে। আমার আব্বা-দাদা কেউ থাকলে তবেই আসবেন।'

এ কথায় শামসুল অত্যন্ত লজ্জিত হল বটে; কিন্তু বিচলিত হল না। বলল, 'লজ্জা দিও না বদরু! আমি তোমার সর্বনাশ ঘটাতে আসিনি। চোখের দেখা দেখলেও কি সর্বনাশ করা হয়? পানিতে নামলেই কি মাছ ধরা হয়?'

- আপনি বললেও লোকে তো তা ভাববে না। পাড়াগ্রামের মানুষ এ বিষয়ে বড় স্পর্শকাতর। তিলকে তাল করে প্রচার করতে বড় পটু। এ অভিজ্ঞতা আপনার থাকবে আশা করি।

- বেশ তারই যদি ভয় হয়, তাহলে আমি আর আসব না। কিন্তু একটি কথা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমি মনে-প্রাণে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। জানো বদরু? তোমার নামে তুমি ললনা-গগনে পূর্ণেন্দু। আর আমার নামে আমি কি জানো? আমি ধরণীর আকাশে প্রভাকর! তা হলে এ দুয়ের প্রগাঢ় সম্পর্কের ঔচিত্য কি?

- ঔচিত্য আপনিই জানেন। কারণ, আমি তো ভালবাসিনি।

- হুঁ, কিন্তু চাঁদের নিজস্ব কোন আলো না থাকলেও সূর্যের নিকট হতে পেয়ে সে যে তিমির রজনীকে জ্যোৎস্নাপুলকিত করে। আমার ভালবাসার আলোতেই তোমার ভালবাসা বিকশিত হবে, তাতে আমি আশাবাদী। আর আশা রাখি যে, দাম্ভিকতার অন্তরালে লুপ্ত হয়ে তুমি অমাবস্যা ডেকে আনবে না। এগুলো রেখে নাও বুঝলে।

এই বলে শামসুল প্রস্থান করল। বদরু তার দিকে ক্ষণেকের তরে দৃক্পাত করে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। আর কিছু বলল না তাকে। কেবল তার মনে জেগে উঠল নতুন কোন অজানা শিহরণ।

(৩)

ঘরের দাওয়ায় পিতা-পুত্রে একত্রে বসে গল্প করছিল। অনতি দূরে বদরুন্নিসা তা নিরীক্ষণ করছিল। তারা যে বড় এক দুর্ভাবনায় ভুগছে তার বহিঃপ্রকাশ বদরুর চক্ষুকে এড়িয়ে যেতে পারল না। আজ তার চোখে তাদেরকে যেন নতুন মানুষ বলে মনে হল। কেন তাদের মন এত ভারি-ভারি, আর কেনই বা তাদের সোনার দেহ দিনদিন মাটি হয়ে যাচ্ছে, তাই সে বুঝার প্রচেষ্টা করছিল। কারণ, আজ যেরূপ বিষণ্নতায় তাদেরকে সে লক্ষ্য করেছে ইতিপূর্বে কোনদিন সেরূপ পরিলক্ষিত হয়নি। তাদের এ 'নাই-নাই'-এর সংসারে কত জ্বালানুভব করতে হয়, তা বুঝলে বদরু ভাবল এর কারণ আরো অন্য কিছু এবং তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু পরেই পিতা সেখান হতে উঠে গেল। বদরু সুযোগ বুঝে চট্ করে পিতামহের কাছে গিয়ে বসল জিজ্ঞাসু হৃদয় নিয়ে। পিতামহ পৌত্রীর উদ্দেশ্যে ক্লেশের হাসি হেসে বলল, 'কি ব্যাপার! আজ পড়তে যাওনি?'

'একটু পর যাব।' - বলে দাদুর হাতখানি নিজের কোলে টেনে নিয়ে পুনরায় বলল, 'দাদু! তোমরা কিসের গল্প করছিলে?'

দাদু বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠল, 'শুনলে নাকি?'

- না। শুনলে আবার জিজ্ঞেস করি?

পিতামহ একটু অন্যমনস্ক হয়ে কি ভেবে নিয়ে একটা টানা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'হুঁ--।'

বদরু সেই শ্বাসে চমকে উঠল। ক্ষণেক পরেই বলল, 'বল না কি কথা?'

পিতামহ পৌত্রীর অভিমানার্দ্র কণ্ঠের তাকীদ শুনে একটু না হেসে পারল না। বলল, 'ওসব তোমাকে শুনতে হবে না। শুনলে হয়তো ভাত খাবে না।'

বদরুর মনের আকাশে সন্দেহের কালো মেঘ আরো ঘন হয়ে জমাট বাঁধল। বুঝল, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সাধারণ নয়। মুখ বাঁকা করে বলে উঠল, 'কিন্তু শুনতে না পেলে হয়তো পানিও খাব না।'

পিতামহ বুঝল বদরু নাছোড় বান্দী। তাই আর একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তাহলে শুনবেই? ছাড়বে না?'

- না।

- তুমি এর মধ্যেই যে বেড়ে উঠেছ, তাই যত চিন্তা।

ব্যাপারটা এবার পূর্বের আন্দাজমত সহজেই বদরুর অনুভূত হল। প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে উঠল, 'আমি বেড়ে উঠেছি তো তোমাদের কি?' তারপর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় প্রশ্ন করল, 'বেশি ভাত খাচ্ছি, তাই নিয়ে চিন্তা?'

পিতামহ এবারে হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'বাঃ! তুমি কি বুঝো না যে, তোমার বিয়ে দিতে হবে?'

বদরু লজ্জা পেয়ে রেগে উঠে বলল, 'যাও, আমি বিয়ে করব না।'

- অমন তো মুখে সবাই বলে; কিন্তু বিয়ে না করে আছে কয়জন?

লজ্জাশীলা বদরু আর সেখানে দাঁড়ালও না। ত্রস্তপদে পিতামহের কাছ হতে প্রস্থান করল।

(৪)

সেদিন এশার নামায পড়ে বদরু বিছানায় শয়ন করলে ধূমায়িত চিন্তাগ্নি হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল তার মরুময় হৃদয়-প্রান্তরে।

তার বিবাহ দিতে হবে। বিবাহে পণ লাগবে, খরচ হবে অনেক। টাকা কোথায় পাবে? যার জন্য তাদের মলিন মুখে ম্লান হাসি। তবে কেন সে বিবাহ করবে? বিবাহ করেই বা কি হবে? বিবাহ না করলেই বা কি হবে? তার বিবাহ না হলে পিতা-পিতামহের অন্তর যদি চিন্তাশূন্য হয়, তাহলে তাতেই যে তার পরম সুখ। পিতার সিক্তচক্ষু দেখে নাই বা হল তার পতিপ্রেমের দরিয়ায় ডুব দেওয়া। আর সে প্রেম ও সুখেরও কি কোন নিশ্চয়তা আছে? আব্বা-দাদুর হাসিমুখ দেখলেই তো তার যাবতীয় সুখ।

কিন্তু বিবাহ যে আনন্দবাহী। চরম খুশীর ঝড় সেদিন সকলের মনে। পরম আনন্দ উপভোগ করে সকল পক্ষ। কিন্তু তাদের এত দুশ্চিন্তা কেন?

যেহেতু এ সমাজে বিবাহে, একজনের বাগান উজাড় করে একজনের খুশীর বাগান সুসজ্জিত হয়। কারো সর্বনাশ ও কারো পৌষমাস হয়। কারো ঘর পোড়ে, কেউ তাতে আলু পোড়া খায়।

নানা চিন্তার জঙ্গলভূমিতে প্রবেশ করে চিন্তার গতি অমঙ্গলের লতায় জড়িভূত হলে বদরু মনে মনে স্থির করল যে, সে বিয়েই করবে না। কারণ, এ বাড়ি হতে সে চলে গেলে আব্বা-দাদুকে দেখবে কে? তাদেরকে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত রেঁধে খেতে দেবে কে? সারাদিন মাঠে খেটে জ্বলে-পুড়ে যখন তারা বাড়ি ফিরবে তখন কে তাদেরকে পিপাসায় পানি, ক্ষিদেয় খাবার এনে দেবে? আমি ছাড়া তাদের তো আর কেউ নেই। এই মত কত শত কথা ভাবতেই অশ্রু গড়িয়ে আসে তার আয়তলোচন থেকে।

এমনি করে পনের দিন গত হল। পিতাকে দেখে বদরুর বক্ষ যেন বিদীর্ণ হতে লাগল। তার বিয়ে দিতে হলে ভাবী বর ও তার সাতগুষ্ঠিকে টাকা ব্যতীত আরো কত কি যৌতুক হিসেবে লাগবে, তাতে কত খরচ হবে, কত টাকা লাগবে, তা কোথায় পাবে? এই দুশ্চিন্তা করে পিতা বুঝি এই রকম কঙ্কাল হয়ে উঠছে -- এ কথা বদরু মর্মে মর্মে অনুভব করল।

কিয়ক্ষণ পরে চিন্তার মোর ঘুরিয়ে আবার ভাবতে লাগল, তবে কি শামসুলই তার সমব্যথী? সে তেমনি করেই মাঝে-মধ্যে এসে তাকে কত কি বলে যায়। যত কথা সে বলে তার সারমর্ম এই যে, সে বদরুকেই জীবন-সঙ্গিনীরূপে মনোনীত করেছে। কিন্তু এর প্রত্যুত্তরে বদরু তাকে চুপ-রাজার কাহিনী শুনিয়েছে। আশাও দেয়নি, নিরাশাও নয়। কারণ তারা বড়লোক।

পরে যখন পিতা-পিতামহকে চিন্তিত ও কন্যাদায় পীড়ায় পীড়িত হতে দেখল, তখন সে শামসুলের প্রস্তাবকে 'না-হুঁ, না-হুঁ' করে মনে মনে প্রাধান্য দিয়েছিল। যাতে ক'রে পিতার ভার হাল্কা ও ধর্মের দায়িত্ব পালন করা সহজসাধ্য হয়। এতদিন সে কতবার বলেছে, বিয়ে সে করবে না, বিয়েতে সে সুখ পাবে না। কিন্তু সে কথায় কেউই কর্ণপাত করেনি। পিতামহ বলে, এটা তাদের ফরয কাজ। অতএব তাতে আর অরাজী হওয়ার কথা কোনক্রমেই গ্রাহ্য নয়। তাই জোর দিয়ে সে কিছু বলতেও যায়নি। কেবল নির্জনে সকলের অলক্ষ্যে 'তাদের কি হবে' -- এই চিন্তায় অশ্রু বিসর্জন ব্যতীত কোন উপায়ান্তর পায়নি।

এখন পিতামহ আর সে রকম কোন কাজে হাত দিতে পারে না। প্রায় সময় ছোট ঘরের তক্তার উপর গা এলিয়ে শুয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে বদরুকে ওজুর পানি আনতে বলে। বদরু পানি ছাড়া আরো দরকারী জিনিসপত্র দিয়ে তবে নিজের কোন কাজ কিংবা আরাম করতে সুযোগ পায়।

আজ ঠিক সেই ঘর থেকে ডাক এল, 'বদরু--?'

বদরু আপন মনে বিবাহযোগ্য গ্রাম্য মেয়েদের অভ্যাসমত রুমালে ফুল করছিল। ত্বরিৎ-পদে উঠে গিয়ে বলল, 'কিছু বলছ?'

দাদু সস্নেহে বদরুকে বসতে আদেশ করল। বলল, 'একটি কথা আছে। কি করছিলে?'

'রুমাল করছিলাম' -- বলে তক্তার এক কোণে উপবেশন করল।

পিতামহ হাসিমুখে বলল, ' বদরু! তোমার মন প্রায় সময় বিষণ্ন থাকে কেন বল তো?'

বদরু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'আমার মন? কই না তো। বরং সর্বদা তোমরাই বিষণ্নচিত্ত।'

পৌত্রীর পৃষ্ঠদেশে হাত রেখে পুনরায় পিতামহ বলল, 'পাগলী! বিয়ে করতে হবে না?'

বিরক্তি প্রকাশ করে বদরু বলে উঠল, 'যাও! এই জন্যই ডাকলে বুঝি?' বলেই যেন পালাতে যাচ্ছিল। পিতামহ হাতে ধরে বসিয়ে বলল, 'শোন! কাল আমাদের বাড়িতে কুটুম আসবে। তাদের জন্য ভালো করে নাশ্‌তা-ভাত রান্না করতে হবে বুঝলে?'

কুটুম ও ভালো রান্নার কথা শুনেই বদরুর হৃদয় দুলে উঠল। ক্ষণেকের জন্য পিতামহের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ভারি গলায় প্রশ্ন করল, 'কুটুম? কোত্থেকে আসবে?'

- বীরভূম থেকে।
- বীরভূমে আমাদের কোন কুটুম আছে বলে তো মনে হয় না।

এবার পিতামহ একটু হাসল; বলল, 'নতুন কুটুম যে।'

বদরু সমস্ত অনুমান করেও সবিস্ময়ে বলল, 'নতুন কুটুম। সে আবার কি রকম?'

- হ্যাঁ, ঐ রকমই। তোমার বিয়ের নব সম্বন্ধ নিয়ে আসবে।
- আমার বিয়ের ?
- তবে কি আমার? নাকি তোমার বাপের? তোমার দেখছি কচি খুকীর মত অবান্তর কথা!

বদরু লজ্জিতা হল। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'আমি যে বললাম, বিয়ে আমি করব না।'

দাদু বলল, 'ছিঃ! পাগলামি করো না। আমাদের যা কর্তব্য তা বজায় না করলে আমাদের পাপ হবে। আর তুমি যদি গুরুজনদের সে কর্তব্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে বাধা দাও, তাহলে তোমার পাপ অনিবার্য। ও সব কথা মুখে এনো না।'

বদরু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মনে মনে বিড়্‌বিড়্ করতে করতে প্রস্থান করল।

(৫)

নব সম্বন্ধ যারা গড়তে এসেছিল, তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিবাহের দেনা-পাওনা নির্ধারিত করে তাদেরকে বিদায় দিতে অনুরোধ জানাল। পুত্র সমস্ত ভার মুরব্বী ও বৃদ্ধ পিতাকে দিয়ে অন্য কাজে অবসর গ্রহণ করল।

বৃদ্ধ বলল, 'বলুন, আপনাদের অভিমত কি? আগামী মাসেই একটা শুভদিন ধার্য করা যায় কি না ?'

বরপক্ষের জনৈক ধূর্ত তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'দিনের কথা পরে হবে, আগে দানের কথাটা হোক।'

বৃদ্ধ সবই বুঝল। ধীরকণ্ঠে বলল, 'আপনারাই বলুন, কত কি লাগবে? তবে খেয়াল রাখবেন, আমরা গরীব মানুষ।'

বরপক্ষের একজন বলল, 'বিশেষ কিছু না। তবে হাজার দশ টাকা, আর আপনাদের জামাই-এর শখ একটি রেডিও ও ঘড়ি। আর বাকি সাজবাজ আপনারা মানিয়ে নেবেন।'

নিরাশার সঘন তমস বৃদ্ধের চক্ষুর্দ্বয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মনে হল, যদি বসে না থেকে সে দাঁড়িয়ে থাকত, তবে হয়তো মাথায় চক্র এসে ভূপতিত হত। যার কিছুই নেই। একটি মাত্র গরুই যার সম্বল, সময়ে-অসময়ে গায়ের রক্ত। তাকে বলে কি না, আমি তোমার কিছুই চাই না, শুধু ঐ কালো গরুটা চাই। হায়রে চাওয়া! হায়রে পাওয়া!

এ অকস্মাৎ ঝটিকার মাঝে যে বৃদ্ধ নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়াতে পারবে তা সে বিশ্বাসই করতে পারেনি। কথোপকথনের সমরাঙ্গনে যে কথা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নেমেছে, তার মোকাবেলায় কোন্ কথা আনবে তাই সে ভাবতে লাগল। এক হাঁকেই তার হৃদয় রিক্ত। মন ও মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত। তবে কিই আর বলবে? কিছু বলার দ্বার যে তারা রুদ্ধ ক'রে নিরাশ ক'রে দিয়েছে।

আলোচনায় নীরবতা নেমে এল। মেয়ের বাবা সেখানে উপস্থিত থাকলেও তার মুখে কোন কথা শোনা গেল না। প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পর গাছের একটা ঝোপকে যেমন ঝিমমারা দেখায়, ঠিক তেমনিই সে ঝিমিয়ে পড়েছিল। পিতাপুত্রকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন বিচারালয়ের কাঠগড়ায় দন্ডায়মান দুটি আসামী। কোন মহাপরাধের শাস্তি তাদের উপর নির্ধারিত হতে চলেছে!

কিছুক্ষণ পর একে অন্যের প্রতি দৃষ্টি আবর্তন করে পিতা বলল, 'দেখুন, প্রথমেই আমি বলেছি যে, আমরা বড় গরীব---।'

কথাটা সম্পূর্ণ করতে বৃদ্ধের কণ্ঠরুদ্ধ হল। ভালোরূপে গলা ঝেড়ে কিছু বলার আগেই পাত্রপক্ষের একজন বলে উঠল, 'বড় গরীব বললে তো আর মেয়ের বিয়ে হবে না বাপু!'

পিতাপুত্র মুহূর্তের জন্য হতাশ হয়ে তাদের মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল। পরক্ষণে বৃদ্ধ আনতলোচনে আকম্পিত কণ্ঠে আমতা আমতা করে বলল, 'যতটা বলেছেন ততটা দেবার মত সঙ্গতি আমাদের নেই। কাজে লাগার মত কথা বলুন।'

একজন বলল, 'যা বলার আমরা বলেছি, এবার যা করণীয় আপনারা করুন।'

ততক্ষণে ও পাড়ার মোড়ল এসে হাজির হয়েছিলেন। ডাকা হয়েছিল অনেক আগে; কিন্তু কোন কারণবশতঃ তিনি আসতে পারেননি। 'কোথায় কুটুম?' বলে কক্ষে প্রবেশ করতেই বহিরাগত মেহেমানদের সালাম জানিয়ে একপ্রান্তে উপবেশন করলেন। অতঃপর সর্ববিষয়ে অবগতির পর বললেন, 'আচ্ছা আমাদের ভাবী জামাই কি করে?'

চট্ করে পাত্রপক্ষের দালাল সাহেব (?) বলে উঠল, 'জামাই সার্ভিস করে; চাষে হাতই দেয় না।'

মোড়ল মশায় দুচোখ কপালে তুলে বললেন, 'সত্যিই সার্ভিস করে?'

- তবে কি মিথ্যা বললাম নাকি? দালাল হেসে উত্তর করল।

- বাঃ! খুব ভালো। কিন্তু কোন ডিপার্টমেন্টে জানতে পারি কি?

দালাল সাহেব মনে হয় একটু শিক্ষিত হবে। মাথা চুলকিয়ে নির্দ্বিধায় উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। সিউড়ির 'মার্কেট রিক্সা অফ লিমিটেড ডিপার্টমেন্টে!'

অনুমান সত্ত্বেও মোড়ল মশায় না বুঝার ভান করে বলে উঠলেন, 'এ্যাঁ! বেশ বুঝতে পারলাম না। একটু খুলে বলুন।

- মানে সিউড়িতে ----।' বলে থেমে গেল দালাল।

- আচ্ছা বুঝেছি। রিক্সা চালায় তাই না?

পাত্রপক্ষের মুখপাত্র মুখ নিচু করে বলল, 'না - হুঁ, ঐ রকমই বটে।

মোড়ল মশায় মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ! আপনারা কোন্ মুখে এত টাকা পণ চাচ্ছেন? সামান্য একজন লোক রিক্সা চালিয়ে খায়, সে এত টাকা নিয়ে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে ভেবেছেন?'

তারপরই বিড়্‌বিড়্ করে বক্তৃতা শুরু করলেন, 'না, ছিঃ! এ যুগের মানুষ কত নীচ হয়ে পড়েছে! কত লোভের বশীভূত হয়েছে! আরে মশায়! যার ঘরে ভাত নেই, চালে খড় নেই, সে আবার বলে কি না, দশ হাজারের কম ছেলের বিয়েই দেবে না। আবার বলে কি না, 'ছেলে চাকরি করে!' ওঃ কত বড় আস্ফালন! চাকরির নাম শুনে তো মেয়ের বাবা জামাই করার জন্য ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু সে কলকাতায় কোন চায়ের দোকানে এঁটো চায়ের কাপ ধুয়ে চাকরির গর্ব করে তাও জানা গেছে। কেউ আবার ভাঙ্গা কাঁচ কেনা-বেচা করে উন্নত ব্যবসার কথা উল্লেখ করে। ছিঃ ছিঃ! কত আর দেখব, কতই আর শুনব?'

পরক্ষণে বদরুর পিতামহকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আর বর কোথাও মিলল না? বাদ দিয়ে দাও। ওরা চলে যাক। শুধু শুধু মেয়েটাকে যেখানে সেখানে দেবে কেন? খুঁজে দেখ, নিশ্চয় জোড় মিলবে।'

মোড়ল মশায়ের বক্তৃতা শেষ হতেই পাত্রপক্ষ কেলে সাপের মত ফোঁস ক'রে বলে উঠল, 'আপনার দেখছি খুব লম্বা লম্বা কথা! ইচ্ছে হয় বিয়ে দেবেন, না হয় দেবেন না। -এই তো। আপনার ও রকম বাগ্‌দন্ড নিতে আমরা এত কষ্ট করে আসিনি। আজ কালের মাষ্টাররা যে টাকা উপার্জন করেন, সে তাই উপার্জন করে তা জানেন? যাক আমরা তো জোর করতেও আসিনি। তবে আপনার কথার ধার আমরা ধারব কেন?'

বিতর্ক বাড়ছে দেখে বৃদ্ধ সকলকে চুপ করতে অনুরোধ জানালো। তারপর ভাঙ্গা গলায় বলল, 'বেশ যাতে ভালো হয়, সে রকম একটা ফায়সালা করে নিন। আমি বলছিলাম

হাজার পাঁচ টাকার মধ্যেই ব্যবস্থা করে ফেলুন।'

পাত্রপক্ষ অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, 'টাকার মায়া করলে মেয়েকে ঘরেই রাখতে হবে বাপু। এত কম কি করা যায়?'

পুত্র বলল, 'আমাদের টাকা থাকলে না টাকার মায়া করব? আমরা তো কৃপণ নই। আসলে আমরা নিতান্ত দরিদ্র মানুষ।'

বরের বাবা সকলের উদ্দেশ্যে 'হবে না, হবে না' বলে উঠে পড়ল।

অবশেষে পিতাপুত্রের দুই ফোঁটা অশ্রুপণ নিয়ে পাত্রপক্ষের বিদ্রূপাত্মক প্রহসন তীরের সাথে পাত্রীপক্ষের কোমল বক্ষের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে সকলেই মজলিস ত্যাগ করল। বদরুর প্রথম সম্বন্ধ এইভাবেই অনায়াসেই ভেঙ্গে গেল।

(৬)

প্রশ্নে 'সীতার অপর নাম জান কি?' বললে যেরূপ উত্তরে 'সীতার অপর নাম জানকী' হয়, ঠিক তদ্রূপই 'দুনিয়াটা কার?' প্রশ্নের উত্তরে 'দুনিয়া টাকার' বললে অত্যুক্তি হবে না। এ নশ্বর জগতে যার টাকা নেই, তার মরণ ভালো, এ কথা কতটা সত্য তা কেউ না জানলেও বদরুন্নিসার মত বহু মানুষ মর্মে মর্মে জেনেছে। টাকার অবর্তমানেই তাদের সংসারের এ দুরবস্থা। আর তার জন্যই তো তার মত কত শত গরীব মেয়েদের বিবাহ স্থগিত রয়ে যাচ্ছে, তা সে কতবার ভেবে দেখেছে।

এক কাল ছিল, যখন বলা হত, 'কনের মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে।' কিন্তু আজ তার উল্টো। যদিও বহু মুসলিম দেশে তাই আছে। কিন্তু এ দেশে বর ও তার বাবা 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে, লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে!'

হায়রে টাকা! টাকার বিয়ে! আর মানুষ? মানুষ তার পালকি। নাস্তিক্যবাদে টাকাই তো সর্বশক্তিমান। মানুষ যে মুখী হয়, সে মুখেই টাকার নাম। হর্ষে-বিষাদে জীবনের প্রতি অধ্যায়েই টাকা। চিরন্তন প্রেমের বন্ধনেও চাই টাকার রশি?

মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়েই বুকে লাগে অনলের তীর। আর ছেলের বিয়ে দেওয়ার মানেই, পরের ধনে পোদ্দারি করা। টাকার জমিদারি করা। এক ভায়ের সুখ লুটে নিজের সুখশয্যা রচনা করা।

দরিদ্র-তনয়া বদরু যখন পিতামহের নিকট সমস্ত খবর শুনল, তখন তার মর্মে পীড়া হানল। শপথ করে বলতে যাচ্ছিল যে, সে বিবাহ করবে না। কারণ সে তাতে সুখী হতে পারবে না। অতএব তারা যেন অনর্থক তার জন্য পাত্র খুঁজে তার মনকে বিচলিত না করে। শুধু দুঃখ পোহানোই সার হবে, হয়তো আশা পূর্ণ হবে না। কিন্তু দাদু তাকে সাবধান ক'রে এ রকম কথা উচ্চারণ করা হতে বিরত রাখল।

বদরুন্নিসা চুপ করেছিল বটে; কিন্তু তার অন্তর দিবারাত্রি বক্ষের অন্তরালে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে উঠছিল। সে তার শোকার্ত হৃদয়ে আন্দাজ করে রেখেছে যে, যদি তার বিবাহ দিতে হয়, তবে পিতার যেটুকু জমি আছে এমনকি ভিটেটুকুও হয়তো বিক্রি করতে হবে।

কিন্তু এই যদি পরিণতি হয়, তাহলে তার পিতা-পিতামহ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এমন সোদর ও দোসর কে আছে যে, তাদেরকে সামান্য বাসস্থান দিয়ে তাদের হা-হুতাশের বিগলিত অশ্রুকে মোচন করবে? আর কেই-বা তাদের অন্নবস্ত্রের ভার নিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করে হতভাগী মেয়েকে সুখী করবে? যদি না থাকে, তবে সে কেমন করে বিয়ে ক'রে সুখী হতে পারে? কেনই-বা শুধু শুধু মরীচিকার মত মিথ্যা সুখের প্রতি দৌড় দিয়ে ক্লান্ত ও নিরাশ হবে?

পিতামহ, কখনো বা পিতা কত জায়গায় সেই দরিদ্র হতভাগীর জন্য গেছে তার ইয়ত্তা নেই। যেখানে বরের খবর শোনে সেখানেই যায়। কিন্তু তাদের একমাত্র কন্যাকে সঁপে দেওয়ার মত এমন কোন পাত্র ও স্থানের সন্ধান পায়নি। কল্যাণপুরে গিয়েও কোন কল্যাণ হয়নি। ঘরে-বরে সবদিক দিয়েই 'কল্যাণ' নাম সার্থক হয়েছে; কিন্তু শুধু প্রদেয় দানের ক্ষেত্রেই অকল্যাণমূলক মর্মভেদী উত্তরে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে।

পিতা গিয়েছিল দয়ালপুর। সেখানেও এ বেচারা গরীবের প্রতি কেউ দয়াল হয়নি। কেউ দয়া প্রদর্শন করেনি তাদের অসচ্ছল সংসারের মেয়েটির জন্য। দয়া তো কেবল টাকার উপর নির্ভরশীল।

তারপর একদিন মুসলিমাবাদ গিয়েছিল। মুসলিম ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েও সেখানকার কোন ভাই নিজ ভ্রাতৃকন্যাকে উদ্ধার করতে 'মুসলিম' বলে পরিচয়টুকুও দেয়নি। যেহেতু সে বন্ধনেও চাই টাকার রজ্জু।

সেখান হতে গিয়েছিল মুহাম্মদপুর, আহমদপুর। মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরীয়তের নির্দেশ, 'তোমরা উপযুক্ত মোহরানা প্রদান করে নারীকে স্ত্রীত্বে বরণ কর।' কিন্তু মুহাম্মদপুর ও আহমদপুর ছাড়াও দেশের অন্যান্য উম্মতে মুহাম্মদীরাও তাঁর প্রকৃত উম্মতের পরিচয়টুকু দেয়নি। যেহেতু পরিচয়পত্র হল টাকার ট্যাঁক। তাই মোহর দিয়ে নয়; বরং মোহর নিয়ে হবে স্ত্রীত্বে বরণ। নবীর উম্মত ঠিকই; কিন্তু টাকার লোভে দোষ কি? এমন যুগ মানুষ গড়বে, যাতে টাকা দিয়ে কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রী না কিনে টাকা নিয়ে কিনতে পারা যায়। গড়েছেও তাই, তাই চাই শুধু টাকা।

পিতামহ গিয়েছিল পরিহারপুর। নাহক পণ গ্রহণ না করা এবং এ কুপ্রথা পরিহার করা অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু গ্রামের নাম পরিহারপুর বলেই কি তারা 'এক রাত মেঁ মালদার' হওয়ার মত সুযোগ পরিহার করবে? তাও কি যুক্তি-সঙ্গত?

টাকা বিনে কোন কাজ সিদ্ধ হয়? টাকা বিনে সাফল্য আছে? মুক্তি আছে টাকা বিনে? টাকাই তো মূল। টাকাই বিক্রমশালী, প্রতাপশালী, বিপত্তারণ! যার আছে টাকা, তার সব পাপ ঢাকা! যার নাই টাকা, তার সব কথাই ঢাকা!

সব কথা ফাঁকা, আসল কথা টাকা। আর কবির এ কথা সবক্ষেত্রে সত্য নয়, কড়িতে কি
জোটে মান বড়িতে খিঁচুড়ি, গুড়েতে কি খাজা হয় এক আঙ্গুলে তুড়ী? বরং প্রকৃত সত্য
হল, কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই, কড়ি বিনে বন্ধু কই?

এশার নামায পড়ে সকলেই নিদ্রাভিভূত হয়েছে। কেবল বদরু তখনও ঘুমায়নি। সমাজের বর্তমান অবস্থা তার মনে পর্যালোচিত হতে লাগল। তাদের সমস্যা যেহেতু টাকা নিয়ে ও তাকে নিয়েই তাই তার মনে সে বলতে লাগল, কেন এ সব হয়?

কালো মেয়ে বউ করতে সহজে কেউ রাজি হয় না। সম্বন্ধ নিয়ে এলেই একটু নাক উঁচিয়ে বলে, 'ময়লা রঙ।' কিন্তু বরের বাবা যখনই হাজার হাজার টাকা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পায়, তখনই 'কালো মেয়ে' টাকার ভিটামিন টনিকের প্রতিক্রিয়ায় চন্দ্রাননী হয়ে বধূ হওয়ার সুযোগ পায়। কালো জমাট বাঁধা মেঘের ভিতরে ঘর্ষণ যত জোর হয়, তত জোর সগর্জনে বিদ্যুদ্দীপ্ত হতে থাকে। অনুরূপ টাকার জমাট বাঁধা স্তূপ যত বড় হয়, তার থেকে সেই কালো মেঘের মত বধূ তত বিদ্যুৎপ্রভ হয়ে ওঠে ঐ লোভী বরের বাবার কাছে। আবার যদি অষ্টমঙ্গলার বরাভরণ না দিয়ে যদি বলা হয়, 'বাবা! এখন পারা গেল না।' তাহলেই বিপদ! সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়ে হয়ে ওঠে চুলোর ছাই প্রদীপের কালি। তখন হয়তো গঞ্জনায়-ভর্ৎসনায় মেয়ের পদতলে মাটিও থাকে না। কিন্তু পাওনা মিটিয়ে দিলেই আবার রূপও ফিরে আসে, গঞ্জনার গুঞ্জন-ধ্বনিও বন্ধ হয়ে যায়। মোট কথা যত দিতে পারা যাবে বিয়াই-জামাতাকে, ততই তারা নিম্নস্থানীয়া কন্যাকে শীর্ষস্থানীয়া করে রাখবে।

কোন যুবতীর কলঙ্ক দেশময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে, যার ফলে তার বাবা শত চেষ্টা করেও তার বিবাহ স্থির করতে পারছে না। যার কাছেই যায় সেই বলে 'চরিত্রহীনা মেয়ে' বউ করলে সংসার জাহান্নামে যাবে। লোক সমাজে নিন্দনীয় কাজ হবে। কিন্তু তার বলার কারণ এই যে, বাবা টাকার অঙ্কটা কম ক'রে বলেছে। তাই বরের বাবা ঐ ওজুহাতে তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে বেশী টাকার সন্ধানে পাত্রী খুঁজবে। অতএব দশ হাজারের জায়গায় যদি বিশ হাজারের ওয়াদায় অর্ধেক বায়না দেওয়া হয়, তাহলে বরের বাবা সত্বর ঐ টাকার গঙ্গায় কলঙ্কিতা ও অপবিত্রা মেয়েটিকে উত্তমরূপে গঙ্গাস্নান করিয়ে নিষ্কলঙ্কা ও পবিত্রা করে মহাসমারোহে ধুমধামের সাথে ঘরের বধূ করে তুলে আনবে। লোকে কিছু বললে প্রাপ্ত বিশ হাজারের কিছু টাকার তুলা বানিয়ে কান বন্ধ করে রাখবে। শুনলেও না শোনার ভান করে উড়িয়ে দেবে। টাকার কথার আগে বিয়ে দিলে লেঙ্গুরবিশিষ্ট অমানুষ হত; কিন্তু সেই টাকার মহামন্ত্রে লেঙ্গুর খসে যাবে!

তখন সংসার জাহান্নামে যেত, আর এখন টাকার পূর্ণ হেদায়াতের ফলে সোজা জান্নাতে যাবে! এ দিকে মেয়ের বাবার ইজ্জতও বাঁচবে এবং পঞ্চমুখে মুখরিত হয়ে ওঠা কলঙ্ক চাপাও পড়বে। কিন্তু আবার শীতের সময় যদি তিনশত টাকা দামের একখানা শাল মেয়ের বাবা না দেয়, তাহলে সম্ভবতঃ কলঙ্ক আবার জেগে উঠবে শীতের পরে গাছে পাতা গজানোর মত।

ফলকথা কন্যাপক্ষ যদি টাকার পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট না রাখতে পারে, তবে বরের বাবা দেবতা কন্যার সাত গুষ্ঠীকে তার চরম শাপে ধ্বংস করে ছাড়বে। বিয়াই মনসাকে টাকার ধূপধূনা দিয়ে শান্ত না রাখতে পারলেই পিতাকে না পারলে কন্যাকে সাপ হয়ে দংশন করেও তৃপ্তি পাবে না। সে দংশনে কারো মৃত্যু হলে বাম হাতে হলেও টাকার পূজা পেয়ে পুনরায় নিজ মন্ত্রবলে বাঁচিয়ে তুলতেও জানে বরপক্ষ।

বরপক্ষের তরফ থেকে বিবাহ-বন্ধনে অবহেলার শৈথিল্য পরিদৃষ্ট হলে, তা দূর ক'রে বন্ধন মজবুত ও সুদৃঢ় করতে সহযোগিতা করে টাকার গোঁজা।

কোন মেয়ের বাবা দশ বিঘা জমির লোভ দেখিয়ে কোন অমত বরের বাবাকে মত করাল। তারপর যখন সে জমির লালসায় লালায়িত হয়ে বিবাহে সম্পূর্ণ রাজি হবে, তখন যদি তাকে বলা হয় যে, 'মেয়ের বাম চক্ষু অন্ধ' তবুও বিয়াই সাহেব বলবেন, 'তাতে ক্ষতি কি? ছেলে তো আর বউ মায়ের চোখ ধুয়ে পানি খাবে না!' আসলে ছেলে ও তার দরকার টাকা ধোয়া আবে-হায়াত।

অপর দিকে একজন মেয়ে অলোকসুন্দরী। নামায-রোযা, পর্দা-পরহেযগারিতেও কম নয়। কিন্তু তার বাবা বিয়েতে টাকা দিতে পারছে না। যার দরুন সে রকম সুশীলা ষোড়শীরও বিয়ে অসম্ভব। যতই হোক নামাযী, পর্দানশীন। কিন্তু তাদের অমূল্য টাকার কাছে তো নয়। স্বার্থ ও টাকার কাছে ধর্ম যে অতি তুচ্ছ এ হতভাগাদের নিকটে। টাকাই যে মানুষ গড়তে পারে। কিন্তু ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টাকার জয়জয়কার কি সেরা ধর্মের মানুষ মুসলিমের কাছে শোভা পায়?

বদরুকে নিদ্রার আলস্য তখনও স্পর্শ করেনি। এত কথা মনে জাগার পর হঠাৎ তার মনে শামসুলের কথা উদয় হল। সে যে তাকে আশা দিয়েছে। তা নিয়ে সে মনের মাঝে তর্ক-বিতর্ক শুরু করল। সে আশা সত্য কি না? সে কথা আব্বাকে জানাবে কি না? কিন্তু তারা যে বড়লোক। আর হলেই বা কি? সে তো তাকে চায়---।

সেই যৌবন-জোয়ারে ভরা চপল তরুণী শামসুলের প্রতি এতদিন বিরক্তি প্রকাশ করে আসছিল। তার প্রতি বেশ ঘৃণাও জমেছিল। কিন্তু পিতার এহেন জরুরী অবস্থা দেখে আজ তার মন অতি গোপনে তাকে ভালবাসার ফুল উপহার দিল। এতদিন সে তাকে ধরা দেয়নি। কিন্তু আজ এই নিশুতি রাতের কালো পর্দার অন্তরালে শামসুলের মনপ্রাঙ্গনে তার

প্রীতির নিকট আত্মসমর্পণ করল।

(৭)

গ্রাম-বাংলায় ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় মুসলিমদের অনেকে পাশ্চাত্য সভ্যতায় মেতে উঠেছে। প্রগতিশীল (?) লোকেরা ধর্মের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে আলোকপ্রাপ্ত হতে গিয়ে নগ্নতা ও অসভ্যতার অন্ধকারে কানামাছি খেলতে শুরু করেছে। কিন্তু যদি তারা ইসলামের উজ্জ্বল আলোক গ্রহণ করে আলোকপ্রাপ্ত হত, তাহলে নিশ্চয়ই ইহ-পরকালে সুউন্নত হত। এই বিরাট পরিকল্পনার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ছিল বদরুদের গ্রামের কয়েকজন দ্বীনদার মানুষের। ফলে গড়ে উঠেছিল একটি ছোট্ট বালিকা-মক্তব। স্বল্প বেতনে মহিলা শিক্ষিকা মন দিয়ে শিক্ষা দিতেন সেখানে। যাতে মেয়েরা 'আদর্শ মা' হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

বদরুন্নিসা সেই অভিলাষে সেখানে পড়াশোনা করত। যেহেতু উর্দু ভাষাতেই ইসলামী কৃষ্টি-কালচার বেশী, তাছাড়া দ্বীন-শিক্ষার জন্য বাংলা বই-পুস্তকেরও অভাব, সেহেতু বাঙালী দ্বীনদার মুসলিমরা উর্দু পড়ার মাধ্যমে মনের খোরাক সংগ্রহ করতে বাধ্য। আর সেই কারণেই মক্তবের সিলেবাসে আরবী, উর্দু ও বাংলা পড়ার ব্যবস্থা রাখা হয়।

বদরুন্নিসার বড্ড বই পড়ার নেশা ছিল। একাকিনী থাকলে অবসর সময়ে বইই তার সুপ্রিয় সাথী ছিল। নামাযের পর একটু কুরআন পড়ত। তারপর পড়ত মক্তবের সিলেবাস ছাড়া ধার করা নানা বই। সেদিন আসরের নামায পড়ে বদরু উর্দু কিতাবের পূর্বপাঠের পুনরালোচনা করছিল। সাধারণতঃ যে সব পাঠ মনের গভীরে দাগ কাটে সেগুলিকে বারবার পড়তে প্রবৃত্তি হয়। বদরু ঠিক ঐ দাগকাটা একটি কবিতা পাঠ করতে শুরু করলঃ-

'উসী নে বনায়া হ্যায় সারা জাহাঁ,
এহ চাঁদ আউর সূরজ যমী আসমাঁ।
হমেঁ উসনে মিট্টী সে পয়দা কিয়া,
যো কুছ হামকো দরকার থা সব দিয়া।'

শামসুল ঠিক সেই মুহূর্তেই বাড়ি প্রবেশ করল। অবস্থা দর্শনে সে স্তম্ভিত হয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে দাঁড়িয়ে বদরুর পাঠ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে কি পড়ছে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বুঝল হিন্দী কবিতা। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবল, হিন্দী সম্পূর্ণ নয়, তবে কিছু বটে।

যাই হোক হিন্দী সে বুঝে। হাই স্কুলে সে হিন্দী পড়েছে। বদরুর আবৃত্তির সাথে সাথে

ছন্দগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলঃ-

তিনিই সৃষ্টি করেছেন এ বিশাল ধরণীকে,
এই চাঁদ-সূর্য পৃথিবী ও আকাশকে।
তিনি আমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন,
যা কিছু আমাদের দরকার ছিল সবই দিয়েছেন।

হঠাৎ তার মনে ধাক্কা লাগল, 'তিনি' কে? কে এ সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা? কে প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস দিয়ে শূন্যমনকে পূর্ণ করেছেন? যদি তাই হয়, তাহলে বদরু যে তার প্রয়োজনীয় জিনিস। তবে সে কেন তার আপন হতে চায় না?

মনের চরম ভাবাবেগে শামসুল তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। একজন সাধারণ মেয়ে, সে কোন্ ভাষায় কার জয়গান গাচ্ছে? কার জয়গাথা তার হৃদয়-কুসুমে সুরেলি কণ্ঠে? হঠাৎ চকিত হয়ে পুনরায় কান খাড়া করে শুনতে লাগলঃ-

'যেরদস্ত্‌ পর না কর যুল্‌ম ও সিতম,
বল্‌কে খিদমত কর্ বা-সদ লুৎফ ও করম।
উনসে সখতী সে জো তু পেশ আ-য়েগা,
যোর তেরা একদিন মিট্ জা-য়েগা।
দওলাতে দুনিয়া পে তূ মত্ ভূল্‌না,
দেখ্ কর্ ইসকো না দিল সে ফুল্‌না।
পাঞ্জ্ রোয হ্যায় এহ্ সব দওলত তেরী,
যিক্‌র মেঁ উসকে না খো তূ আপনা জী।
দেখ্ অগলূঁ কী না ওহ্ সরওয়াত রহী,
পস তেরে ভী না ঠ্যাহরেগী কভী।
গর্ হামেশা রহতী উনকে পাস আব,
কিস্ তরহ আতী ওহ তেরে হাথ আব?
কব্ হ্যায় মাল ও যিন্দেগানী কো বকা,
সব ফনা হ্যায়, সব ফনা হ্যায়, সব ফনা।
সব ফনা হ্যায়, সব ফনা হ্যায়, সব ফনা।'

এইটুকু পড়েই বদরু ডুকরে কেঁদে উঠল। মনে হয় এর পূর্বেও দু-চার ফোঁটা অশ্রু তার আয়তলোচন হতে ঝরে ঝরে পড়ছিল। শামসুল তা দেখে অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার হঠাৎ রোদনের অর্থ সে বুঝে উঠতে না পেরে ঔৎসুক্য দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে রইল। কারণ যাইবা হোক, তার মনের ভান্ডারে ব্যথা নিশ্চয় সঞ্চিত আছে। তাই তার

ব্যথায় সমব্যথী হয়ে তার অন্তরেও যেন আঘাত লাগল। অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ডাক দিল, 'বদরু--!'

বদরুর সেদিকে কোন খেয়াল নেই। টনটনে ব্যথাভরা মনের আবেগময়ী তরুণী কবিতার শেষ ছত্রটি বারবার পড়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। পুনরায় যেন চক্ষুরুন্মীলন করে পড়তে লাগল ঃ-

'কব্ হ্যায় মাল ও যিন্দেগানী কো বকা,
সব ফনা হ্যায়, সব ফনা হ্যায়, সব ফনা।'

এবারের ক্রন্দনরব অপেক্ষাকৃত উচ্চ হল। শামসুল হতভম্ব হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকল, 'বদরু, বদরু--!'

হঠাৎ যেন বদরুর স্বপ্ন ভাঙ্গল। চমকে উঠে দরজার দিকে তাকাতে দেখে শামসুল বাইরে দাঁড়িয়ে। লজ্জায় তার সর্বাঙ্গ রাঙা হয়ে উঠল। গোপনে বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছে কক্ষের এক কোণে সরে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একবার ভাবল বের হয়ে যায়; কিন্তু লজ্জার বেড়ি পা থেকে ছাড়াতে না পেরে সে কক্ষ মধ্যেই ঢুকে থাকল।

কান্ড দেখে শামসুল বলে উঠল, 'বদরু! তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

এবার বদরু কক্ষদ্বার অতিক্রম করে বাইরে আসতে বাধ্য হল। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিঞ্চিৎ মুচকি হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু অধরে ফোটার আগেই তা দাঁতের গোড়াতেই হারিয়ে গেল। ধরা গলায় বলল, 'আপনি কখন এসেছেন?'

শামসুল স্মিতমুখে বলল, অনেকক্ষণ, ব্যাপার কি? তুমি অমন করে পড়তে পড়তে কেঁদে উঠলে কেন?'

বদরু শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল, 'ব্যাপার কিছু নয়। এমনিই।'

- এমনিই কাঁদছিলে? অসম্ভব।

বদরু ইতস্ততঃ করছিল। আকাশে ছেঁড়াকাটা লাল-সাদাবর্ণের মেঘের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল, 'সে অনেক কথা। সেসব আপনাকে শুনতে হবে না।'

- কেন? আমি কি শোনার কেউ নই?

বদরু মুশকিলে পড়ল। একটু ক্লেশের হাসি হেসে বলল, 'শুনে লাভ কি আপনার? পরের দুঃখের কথা---।'

- তা আমি বুঝব। তোমাকে বলতেই হবে।

বদরু অবনত মস্তকে বলল, 'আব্বার কাছে শুনেছি, পূর্বে আমরা নাকি ধনীই ছিলাম। এখন নিঃস্ব হয়ে গেছি তাই---।'

শামসুল তার মুখ হতে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'দুঃখ হয়? দুঃখের কি আছে? আবার ধনী হয়ে যাবে।'

বদরু সহসায় সবই বুঝল। লজ্জাবনত শির নিচু করেই শাড়ীর কোণ চিবাতে লাগল। শামসুল বলল, 'কাহিনী শেষ? অনেক কথার এই কথা?'

- হ্যাঁ। ওটাই আমার সারাংশ।

- বেশ তুমি কি পড়ছিলে তার অর্থটা একবার গুছিয়ে বল তো শুনি।

- শুনবেন শুনুন তবে ঃ-

'দুর্বলের পরে নাহি কর অত্যাচার,
তবে যত পার কর দয়া শতবার।
তাহাদের প্রতি যুলুম করিলে জানিবে,
একদিন জোর তোমার মিটিয়া যাইবে।
দুনিয়ার ধনে-মালে না থাকো মাতিয়া,
দুনিয়ার সুখ হেরি না যাও ভুলিয়া।
দিন পাঁচ তব এই দুনিয়ার ধন,
তার পদতলে তুমি দিও না জীবন।
পূর্বপুরুষদের দেখ চিরস্থায়ী নাই,
তোমারও যে রহিবে না সন্দেহ কোথায়?
ধন তাহাদের যদি চিরদিন থাকিত,
বর্তমানে কেমনেতে তোমাতে আসিত।
ধন-মাল চিরকাল রবে না রবে না,
সব হবে ধ্বংস ভবে, সব হবে ফানা।'

- শুনলেন তো?

- বাঃ চমৎকার! কিন্তু শিখলে কোথায়?

- গ্রামের বালিকা মক্তবে।

- তাহলে আমাদের ধন-সম্পদ কি সত্বর ধ্বংস হয়ে যাবে?

- 'ধন জন যৌবন জোয়ারের পানি, আজ আছে কাল নাই জানে সব জ্ঞানী।' আল্লাহর ইচ্ছা হলে আগে অথবা পরে।

- তাহলে তোমার আল্লাহ তো বড় স্বেচ্ছাচারী!

কথাটা শুনে বদরুর ভালো লাগল না। সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হল; কিন্তু বাইরে প্রকাশ না করে বলে উঠল, 'আপনি আল্লাহ মানেন না বুঝি?'

- মনকে মানাতে পারি না।

- কারণ?

- বলছি; কিন্তু তার আগে একটি কথা জিজ্ঞেস করে নিই। তিনিই আমাদেরকে মাটি থেকে

সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের যা প্রয়োজন ছিল তা পূর্ণ করেছেন। -এটাই প্রথমে আবৃত্তি করছিলে না?

স্মিতমুখে বদরু বলল, 'হ্যাঁ, সত্যিই তো?'

- বেশ, এবারে বল, 'তিনি'টা কে?

- তিনিই তো আল্লাহ; আমাদের প্রতিপালক।

- আচ্ছা, তারপর বলি, তুমি হয়তো অনুভব নাও করতে পার। কিন্তু আমার শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে তা অনুভূত। তা হচ্ছে আমার জীবনে তোমার মত একজন সুশীলার প্রয়োজনীয়তা; সেটা কি 'তিনি' জানেন না?

- যদি সত্যি-সত্যিই প্রয়োজনবোধ করে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই জানেন। আর না করে থাকলে তাও জানেন।

কথাটা বলতেই বদরু লজ্জায় যেন মাটির সাথে মিশে যেতে লাগল। দাঁতে জিভ কেটে নিজের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতি তাকিয়ে রইল।

শামসুল সসংকোচে বলেই ফেলল, 'তাহলে প্রয়োজন মিটবে তো?'

এ প্রশ্নের উত্তর বদরুর ক্ষমতাধীন ছিল না। সেই সময় সে দ্বৈধ ও লজ্জাশীলতার অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। আর তারই মধ্যে বিপদমুক্তির একটি দাওয়াই সে খুঁজে পেয়েছিল। সেদিনের এই আবেগভরা আলাপনে তার মনের জ্বালা অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল।

(৮)

- নাঃ, তুমি যে কি ধরনের মানুষ আমি খুঁজেই পাই না।ছেলের বাপ হয়েছ, কিন্তু ছেলের মন বুঝো না। ছেলে কেন যে উদাস পাখীর মত ফিরে বেড়াচ্ছে; সময়ে খায় না, মন যেন সর্বদা ভারী-ভারী। কেন এ সব তুমি লক্ষ্য কর না বল তো? তুমি কি ছেলের বাবা নও?

- একশ'বার। কিন্তু কর্তব্যটা কি শুনি? ও সময়ে খায় না তো আমি কি ওকে বেঁধে খাওয়াব?

- আহা! তুমি যেন কিছুই বুঝো না। ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে না?

- ওহো! বুঝেছি। তোমার কিছু আমোদ করার ফন্দি হচ্ছে।

- সে যাই হোক। তুমি তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা কর।

- নচেৎ?

- কথা বলব না।

- বেশ তো। রাতটা গত হতে দাও, তারপর দেখা যাবে।

দেখা যাবে নয়। কসম খাও, বিয়ে দাও, নইলে আমার মাথা খাও।

- সর্বনাশ! বেশ, বেশ, কালই, কালই।

প্রভাত হতেই শামসুলের পিতা তার বিবাহ সম্বন্ধের জন্য অঞ্চলের খ্যাতনামা বিবাহ বাজারের দালাল বুদ্ধিমোড়লকে ডেকে পাঠাল। বৃদ্ধ বুদ্ধিমোড়লের কূট ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন কাজের জন্যই তার এই নাম। তার বুদ্ধির কৌশলখানা খুব কম লোকেরই কাছে ধরা পড়ে। মাঝে-মধ্যে বুদ্ধিহারা হলে অভ্যাস মত একটি বিড়ি না খেয়ে তার বুদ্ধির ঘরে ধুঁয়া না দিলে বিস্মৃত বুদ্ধি আর সহজে প্রত্যাগত হত না।

সময় ও স্বার্থ বুঝে বুদ্ধিমোড়ল পূর্বেই শামসুলের পিতাকে তার বিবাহের কথা জানিয়েছিল। কিন্তু তখন সে এ বিষয়ের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করেনি। রাত্রে স্ত্রী কর্তৃক ভর্ৎসিত হয়ে এবং ছেলের মনের গতি লক্ষ্য করে বিবাহের প্রস্তুতি স্বরূপ সে এই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করল।

সত্যিই মোড়ল যেন এ অঞ্চলের নাম করা দালাল, শিয়াল-ঘটক! কার পুত্রের সাথে কার কন্যার পরিণয় সুসমঞ্জস হবে এবং নিজেও তাদের মাঝে দালালি করে দু-এক শত ওসূল করবে সেই ফিকিরে তার বার্ধক্য প্রায় অতিবাহিত হতে চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ লাঠি হাতে বাড়িতে প্রবেশ করল। বার চারেক অপরিষ্কৃত গলা ঝেড়ে নিয়ে হাঁক দিল, 'কই বাপুজী! ঘুম ছাড়েনি নাকি?'

সাজেদ মন্ডল বাড়ির ভিতরেই ছিল। বৈঠকখানার একখানা চেয়ার ঝেড়ে পরিষ্কার করে বসতে বলল। বৃদ্ধ গ্রীবা সমুন্নত ক'রে বলে উঠল, 'হ্যাঁ বাপুজী! এ সকাল বেলায় বুড়োর সাথে কি দরকার পড়ল?'

সাজেদ মন্ডল তক্তার উপর বসে সহাস্যে উত্তর করল, 'হ্যাঁ, দরকার পড়েছে। আপনি বলছিলেন, কোথায় নাকি একটা ভালো পাত্রী আছে?'

গর্দান হেলিয়ে বৃদ্ধ বলল, ওহ্হো! বিয়ের ব্যাপার? হুঁ হুঁ, তাইতো মাঝে মাঝে বলি, এ বৃদ্ধ মোড়ল ছাড়া আছে কে? কেউ পারে না এমন জোড়া লাগাতে। দেখ তো বাপুজী! বুড়ীটা যখন তখন আমার সাথে ঝগড়া ক'রে বলে, 'তোমার আছে কি? কিসের গরম তোমার?' আচ্ছা বল তো, আমার যদি নাই কিছু, তবে লোকে কেন ধায় পিছু? আর তুমিই বা এ সাত সকালে ডাকবে কেন?

তারপর তার নিজ গৃহমুখে ঘুরে বুড়ীর উদ্দেশ্যে বলল, 'থাম্! তোকে লাঠির বাড়িতে ঘর ছাড়া করে বিয়ে করতে পারছি কি না দেখছি!

সাজেদ মোড়ল বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলে উঠল, 'কি গো মোড়ল! এই বয়সে আবার বিয়ে করবেন?'

- আর বাপুজী! না করলে উপায় কি বল? এমন করে দিনরাত্রি মুরগী-লড়াই আর

ভালো লাগে না। এই রাজ-লড়াইয়ে ওকে নির্বাসন দেব।

- কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সে আপনার পাকা চুল-দাড়ি দেখে মেয়ে দেবে কে?

- আরে বাপুজী! এ যুগে কি আর মেয়ের অভাব আছে? বিনা পয়সায় করলে কত লোক দেবার জন্য তৈরী আছে।

- বেশ, আপনার বিয়ের কথা পরে। এখন আমার ছেলের বিয়ের জন্য পাত্রীর কথা বলছিলাম।

বৃদ্ধ মাটিতে লাঠি ঠুকে বলল, 'হ্যাঁ পাত্রী একটা আছে বেশ মানানসই। তো বিয়ে কি এ বছরেই দেবে বাপুজী?'

- হ্যাঁ, তার জন্যই তো আপনার খোঁজ।

- বেশ এ বুড়ার দ্বারা সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন চিন্তা নেই।

তারপর গলা ঝেড়ে বলল, 'কিন্তু পণ-পান কত কি নেবে বাপু?'

সাজেদ মন্ডল মাথা চুলকিয়ে বলল, 'আমাদের ঘরবর তো দেখছেন। হাজার পঞ্চাশ টাকা আর ভরি দশেক সোনা হলে চলে। তারপর অন্যান্য ব্যাপারে তারা জামাইকে মানিয়ে নেবে। নাকি বলেন?'

বৃদ্ধ ডাগর ডাগর চোখে কট্মট্ ক'রে তাকিয়ে সমর্থন করে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতে কি আছে? তোমার মত লোককে দেবে না তো দেবে কাকে?'

বৃদ্ধ এবার পকেট থেকে বিড়ি ও দেশলাই বের করে ধরিয়ে নিল। একটান নিয়ে ধূমোদ্গার করে বলল, 'তোমার বিয়াই যে হবে, সে কিন্তু বড্ড ভালো মানুষ।'

শামসুলের পিতা কিঞ্চিৎ হাস্য করে জবাব দিল, 'তাই নাকি? ভালো হলেই তো ভালো? কিন্তু বউ কেমন হবে?'

- তোমার বউ? খাসা বউ হবে। লাল টুকটুকে; যেন দুধে-আলতায় ঘোলা!

দু'জনেই ক্ষণেক হাসল। তারপর সাজেদ মন্ডল পুনর্বার তাগিদ করল, 'তাহলে আপনি আজই যান।'

'হ্যাঁ বাপুজী! এক্ষনিই চললাম। বাবা খাজা সায়েব-----।' বলে শির্কভরা কি সব কথা বলতে বলতে বিদায় গ্রহণ করল।

বিকালে বুদ্ধি মোড়ল বুদ্ধির জোরে পাত্রী পক্ষ হতে প্রস্তাবে সমর্থন লাভ করে ফিরে এসে সাজেদ মন্ডলকে বিবাহের প্রস্তুতি নিতে বলল।

এদিকে দু'দিন পর যখন শামসুলের কর্ণগোচর হল যে, তার বিবাহের সম্বন্ধ এক প্রকার পাকাপাকি হয়ে গেছে, তখন সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। পুকুরে জাল ফেললে বন্দী মাছেরা যেমন পরিত্রাণ লাভের আশায় উপযুক্ত ছিদ্র পথের তল্লাশে ছুটাছুটি করে, ঠিক তেমনি শামসুলের দেহমনও করতে লাগল। কি প্রকারে এ অভিনব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা যায়

এবং কি উপায়ে তার হৃদয়াসীন সহচরীর সাথে চিরবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় তার জন্য চিন্তাকুল হয়ে উঠল।

সন্ধ্যাবেলায় শামসুল মাতার উদ্দেশ্যে হঠাৎ বলে উঠল, 'মা! আমাকে এক কথা জিজ্ঞেস না করে তোমরা একি পাগলামি করছ?'

মাতা হেসে উত্তর করল, 'পাগলামি কি বাবা? বড় হয়েছিস্। তাছাড়া ঘরে বউ না এলে কত অসুবিধা আমার।'

শামসুল বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল, 'যাই হোক, আমার সম্মতির আবশ্যক ছিল কি না?'

মায়ের কণ্ঠস্বর একটু উঁচু হল; বলল, 'বিয়ের ব্যাপারে তুই তো একেবারে স্বাধীন নস্ যে, তোর যখন ইচ্ছা তখন বিয়ে করবি। মা-বাপেরও ইচ্ছা ও কর্তব্য বলে কিছু আছে।'

- যাই বা হোক, বিয়ে যখন আমার, তখন পূর্ণ স্বাধীনতাও আমার। তোমরা আমার উপর জবরদস্তি করো না।

এইবার মাতা ক্রুদ্ধ হল; বলল, 'তাহলে আমাদেরকে ঝোঁড়ের কাকই ভাবতে চাস্? ছেলের উপর আমাদের কোন দাপ নেই?'

শামসুল বিপদে পড়ল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'আমি বিয়ে করব না।'

- নিজের মন মতই চলতে চাস্ তাহলে? বেশ তুই তবে ঘর-সংসার দেখে নে। আমরা অন্যত্র কোথাও চলে যাই।

শামসুলের মুখে আর কথা সরল না। শুধু সেই নিরুত্তর মনের গহীন কোণে কে যেন গেয়ে উঠল, 'যো কুছ হামকো দরকার থা সব দিয়া।'

মাতা উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিল। অবশ্য উত্তর যখন মিলল না, তখন তার নিরুত্তর চেহারা অনুমান করে বুঝল যে, সে হয়তো সম্মত হয়েছে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সংসারের কাজে চলে গেল।

এ বিবাহ যে গড়ছে, শামসুল তার খবর জানত। তাই এ সম্বন্ধ ছিন্ন করার জন্য যখন সে উপযুক্ত পন্থা পেল না, তখন সুযোগ বুঝে সেই বৃদ্ধ বুদ্ধি মোড়লের সাথে তার বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করল।

তাকে দেখেই বৃদ্ধ লাঠি ঘুরিয়ে যেন নাচতে লাগল। আপ্যায়ন পূর্বক বৃদ্ধ বলল, 'কি ব্যাপার জামাই বাবু! কোন কাজ পড়েছে নাকি?'

প্রত্যুত্তরে জামাই বাবু বলল, 'মোড়লজী আজ নতুন খেতাবে সম্বোধন করলেন, কারণ কি?'

খুশীভরা কণ্ঠে উত্তর দিল, 'কি দাদুজী! তুমি শোননি বুঝি? না ভান্ করে নতুনভাবে শুনতে ভালো লাগবে, তাই না?'

মোড়ল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। শামসুল অপ্রয়োজন বুঝে আসল বক্তব্যের প্রতি

কথার মোড় ফিরাল। বলল, ‘মোড়লজী! তাহলে আপনিই আমার সম্বন্ধ গড়ছেন?’

- হ্যাঁ দাদুজী! আমিই তো। কিছু কথা আছে?

- কথা এমন কিছু নেই। তবে বলি, সেলামি-টেলামি বেশ মিলছে তো?

হঠাৎ কথাটা শুনে বৃদ্ধের কালো মুখখানা যেন আরো কালিবর্ণ হয়ে উঠল। তবুও উপেক্ষা করে হেসে বলল, ‘সেলামি আর কি দাদুজী? তোমাদের ঘরে দু-চার পাত খানা ছাড়া?’

- বাস্! আর কিছু না?

- কই আর, কোথা কি? দিতে তো হয়, কিন্তু---।

- কিন্তু দেওয়ার ওয়াদা কেউ করেনি? ঠিক আছে, বাপ না দেয়, আমি দেব।

বৃদ্ধ লম্ফ দিয়ে চক্ষু ডাগর করে যেন আকাশে চাঁদ দেখল। তারপর বলল, ‘কতগুলো দেবে দাদুজী? ---এই মানে পুরস্কার আর কি?’

শামসুল সহাস্যে বলল, ‘একশ’ টাকা।’

- একশ’ টাকা!

- হ্যাঁ। একশ’ টাকাই।

বুদ্ধি মোড়ল এবার মনে মনে গুনতে লাগল, পাঁচশ’ আর একশ’ ছ’শ’ টাকা! ছ’ ছ’শ’ টাকা! তারপর প্রকাশ্যে বলল, ‘বেশ দাদুজী! শুকরিয়া। বুড়ি একখানা ঢাকাই পেড়ে শাড়ির সখ করছিল, ভালোই হবে।’

শামসুল রহস্য পছন্দ করল না। বলল, ‘কিন্তু একটা কাজ করতে হবে দাদু!’

চকিত চাহনিতে একবার শামসুলের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ মনে মনে গর্ব পোষণ করে বলল, ‘কি কাজ দাদুজী?’

- কাজটা অবশ্য কঠিন নয় আপনার পক্ষে। আর আপনি ছাড়া তা পারবেও না কেউ। করবেন তো?

লাঠি ঠুকে বৃদ্ধ বলল, ‘কি কাজ বল না দাদু? করব বৈকি? আর না পারলে বুদ্ধি মোড়ল নাম সার্থক হবে না যে।’

- হ্যাঁ, তাহলে শুনুন। যে বিয়ে আপনি গড়ছেন, তা ত্রস্তেই ভাঙতে হবে। কারণ এ বিয়েতে আমি মোটেই সম্মত নই।

হঠাৎ বৃদ্ধ যেন নতুন কথা শুনল। মুহূর্তের জন্য তার গা-টা দুলে উঠল। আকাশ পানে অবিশ্রান্ত নেত্রে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। পরক্ষণে ভাবটা এই দাঁড়াল যে, সে ত্রিভুবন ঘুরে এসেও তার হারানো নিধির সন্ধান আর পেল না। আঙিনার প্রান্তভাগ অবধি পদচালনা করে আকম্পিত কণ্ঠে বলল, ‘কি বলছ দাদুজী! বিয়ে ভাঙতে হবে?’

শামসুল সুদৃঢ় সুরে উত্তর করল, ‘হ্যাঁ মোড়ল দাদু! আপনার গড়া পুতুলকে আপনাকেই

নিজের হাতে ভাঙতে হবে।’

- তাই কি হয় দাদুজী?

- হতেই হবে মোড়ল দাদু।

- না ভাই। তাহলে আমার মান-সম্মান সব যাবে। এ বুড়ো বয়সে পাকা চুলের মাথা নেড়া করে ফেলবে তোমার হবু শ্বশুর।

- নাঃ। আপনার কিচ্ছু হবে না। বলবেন, ‘বরের অমত।’

- যদি না মানে তোমার হবু শ্বশুর, এদিকে তোমার বাপ?

- মানাতেই হবে। নইলে যখন বিয়ের সময় কিছু একটা করে বসব, তখন বুঝবেন। এখন হয়তো আপনার মাথার পাকা চুল যাচ্ছিল, কিন্তু তখন আপনার মাথাটাই যেতে পারে!

বৃদ্ধ মনে মনে ভয় পেয়ে চমকে উঠল। অথচ তা চেপে রেখে উপহাসছলে বলল, ‘সর্বনাশ! কি করবে দাদুজী, গলায় দড়ি নেবে নাকি?’

- উপহাস ভাববেন না মোড়ল দাদু। তার জন্য আমি আসিনি।

- বিয়ে ভাঙতে পারব না দাদু। আচ্ছা কেন বল তো? এতটা বয়স হয়েছে, এখনো কি তোমার বিয়ের সময় হয়নি?

- না, শুনুন। বিয়ে ঠিকই করব; কিন্তু ওখানে নয়।

- সর্বনাশ করেছে! কোথায় মন দিয়ে ফেলেছ দাদুভাই?

শামসুল ম্লান হাসি হেসে বলল, ‘ও গাঁয়ের মন্ডল বাড়িতে।’

বৃদ্ধ বিস্মিত হয়ে বলল, ‘তাই কি হয় দাদুজী? এ দিকে যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

- তাতে অসুবিধা কি? এ্যাডভান্স্ নিয়ে খেয়ে ফেলেননি তো?

- না, না। তা নয়!

- তাহলে ভেঙ্গে ফেলুন ঐ সম্বন্ধ। আর যদি পারেন, তবে ঐ মন্ডল বাড়িতে যোগাযোগ করুন। উপযুক্ত সেলামি পাবেন।

প্রতিকূল বায়ুর প্রতিবন্ধকতায় বৃদ্ধ যেন হাল ছেড়ে বসল। সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হল; কিন্তু তা অপ্রকাশ রেখে বাহ্যতঃ শামসুলের হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে বলল, ‘আচ্ছা, ও গাঁয়ের সেই রওশন আলী মন্ডলের ঘরের কথা বলছ?’

স্মিতমুখে শামসুল জবাব দিল, ‘ঠিকই অনুমান করেছেন মোড়ল দাদু। আমি তার পুতিনকে ভালবাসি। তবে এ কথা প্রকাশ করবেন না যেন।’

নিতান্তই বৃদ্ধ যখন দেখল, তার এ দিকের ঘটকালির সেলামি হাতছাড়া হবে, তখন এ নতুন প্রস্তাবের পাওনা আন্দাজ করে মনে মনে অঙ্ক কষতে লাগল। তাতে যে সে ষোল আনাই ক্ষতির শিকার হবে, তা সহসায় অঙ্কফলে প্রকট হয়ে উঠল। কিন্তু ‘মস্তান’কে

টালাও বৃদ্ধের সাধ্যাতীত ছিল। তবুও চেষ্টায় ত্রুটি না করে বলল, 'কিন্তু দাদুজী! ওরা যে বড্ড গরীব!'

- তাতে ক্ষতি কি? তারা গরীব হলেও মেয়েটি যে সাত রাজার ধন!

বৃদ্ধ উচিত জবাব পেয়ে চক্ষু ডাগর করে কি ভাবতে লাগল। সে স্থির করল যে, শামসুলের নিকট হতে পুরস্কার আগে হাত করবে, তবেই কোন কথা। তুবড়া গালে এক গাল হেসে বলল, 'কিন্তু পুরস্কার কত দেবে দাদুজী?'

- পাকাপাকি সম্বন্ধ স্থির করতে পারলে দু'শ' টাকা। আর বিয়ের পর আরো পাঁচশ' টাকা।

- আচ্ছা বায়না দিয়ে যাও দাদুজী। আমি কালই ব্যবস্থা করছি?

- হ্যাঁ অতি শীঘ্রই অথচ অতি গোপনে যেন এ কাজ হাসিল হয়।

এ কথা বলতে বলতে দু'শ' টাকা পকেট থেকে মোড়লকে বের করে দিয়ে শামসুল সেখান থেকে প্রস্থান করল। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ মুশরেকী স্বভাবমত 'বাবা দাতা সায়েব!' বলে হাঁফ ছাড়ল।

(৯)

এ সংসারে সুন্দরকে সকলেই ভালবাসে। কিন্তু সৌন্দর্যের দুটো দিক থাকে। একটা দিক বাহ্যিক এবং অপর দিক আভ্যন্তরিক। যে জিনিস উভয় দিক দিয়েই সৌন্দর্যমন্ডিত, সে জিনিসকে ভালবাসতে কোন নির্মল হৃদয়ে দ্বিধা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যে জিনিসের উভয় দিকের মধ্যে কেবল একটা দিক সুন্দর থাকে, সেই জিনিসকে ভালবাসতে মানুষের মনে প্রভেদ দেখা যায়। কেউ তো বাহ্যিক সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হয়। আবার কেউ ভিতরের প্রতি অর্থাৎ গুণ-মাধুর্যে মোহিত হয়। কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া ও চয়ন করার সময়ই মানুষ ভুল করে বসে।

শামসুল আলম বদরুন্নিসার মধ্যে উক্ত সৌন্দর্যের দু'টি দিকই লক্ষ্য করেছিল। অতএব দু'টিই ছিল তার নিকটে প্রধান। তাই এই মুগ্ধতার স্বপ্নঘোরে সে তাকেই মনে-প্রাণে মনের কুটিরে চেয়েছিল।

পক্ষান্তরে তার পিতার কোন দিকটার খেয়াল নেই। খেয়াল আছে শুধু অর্থরূপের প্রতি। এটা আবার ভিন্ন দিক; যা অনেকের কাছেই শুধু বিবেচ্য ও বাঞ্ছনীয় নয়, বরং প্রাধান্যযোগ্য। যেহেতু প্রত্যেক মানুষই নিজের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, প্রবণতা ও পছন্দ নিয়ে জিনিসের বিচার করে থাকে, সেহেতু পিতা-পুত্রের বিচারে এই তফাৎ।

পিতার কাছে এ প্রবণতার খবর বুদ্ধি মোড়লই পৌঁছে দিল। পরিস্থিতি শুনে সাজেদ মোড়ল রোষে যেন লাল হয়ে উঠল। প্রতিকার নিরূপণ না করতে পেরে বৃদ্ধের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল।

বৃদ্ধ বলতে লাগল, 'এ জন্যই তো বলি বাপুজী! ছেলেপিলেকে অত সিয়ানা না করে ছোটবেলায় বিয়ে দিয়ে দাও। গলায় 'হোটকা' বেঁধে দিলে তবেই জব্দ! কিন্তু এত বড় করে এবার দেখ তো কি অবস্থা। আবার যদি কোন বড় ঘরে দেখাশোনা করত, তবে তো তার কোন ব্যবস্থা নেওয়া যেত। কিন্তু ঐ ছোট ঘরে কি দেখে বিয়ে করবে আমি তো ভেবেই পাই না। তারা না পারবে হাজার হাজার টাকা দিতে, আর না পারবে জামায়ের মান-খাতির করতে। দেখতো বাপুজী কি রকম মজা? নাঃ, ছেলেটাকে কিছু শাস্তি দেওয়া দরকার। কিন্তু শাস্তি দেওয়াও আবার মুশকিল বাবা! একেবারে মস্তান। মস্ত বাঘ বললেই চলে। এক্ষনি ছিঁড়ে ফেলবে। দেখ বাপু! তুমি যা ভালো বুঝ কর।'

- ওদের মতামতটা একবার জেনে এলে হতো না?

- এ্যাঁ! তাহলে ওখানে জবাব দিতে বলছ? দেখ বাপু! এই যাচা কনে আর কাচা কাপড় ছাড়তে নেই, বুঝলে?

- আপনিই তো এর ফায়সালা দিলেন। এখন নিরুপায়।

- হুঁ, কলি যুগ কি না---।

বলেই বৃদ্ধ উঠল। তারপর বুদ্বুদ শব্দে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে প্রস্থান করল।

রাত্রিবেলায় সকলেই খেতে বসেছিল। হঠাৎ পিতা শামসুলের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'শামু! তুই মোড়লকে কি বলেছিস?'

ব্যাপার বুঝে শামসুল নতমুখে উত্তর করল, 'যা বলেছি, সে নিশ্চয় আপনাকে বলেছে।'

পিতামাতা উভয়েই সমস্বরে বলে উঠল, 'তাহলে কথা সত্যিই।'

শামসুল দৃঢ়ভাবেই বলল, 'হ্যাঁ।'

মাতা হতবাকের মত মৌনতা অবলম্বন ক'রে অধোবদনে বসে রইল। তার ভিতরটা যেন রাগের তাপে ফুটন্ত দুধের মত ফুলে ফুলে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, শক্তি থাকলে শামসুলকে তার লম্বা চুলের গোছা ধরে আছাড়ে পদাঘাত করে। কিন্তু নিরুপায় বুঝে মনে হল যেন সে মেঝেয় মাথা ঠুকে মরে। তবুও ধীরে ধীরে তা সংবরণ ক'রে নিয়ে চুপ করে বসে রইল।

পিতাও যেন অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠেছিল। বলল, 'টাকা-পয়সা ভেঙে পড়াচ্ছি কি না, তাই মা-বাপের কথাকে চুলোর ছাই, পুকুরের পাঁক মনে করছিস! একটু লজ্জা করা উচিত।'

শামসুল বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখার খাতিরেও চুপ থাকল না। সে যেন হক কথা

বলতে মুখ খুলল; বলল, 'মনে করতে বাধ্য। আপনারা শুধু পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভে আমার বিয়ে দিচ্ছেন একজন কালো মেয়ের সাথে।'

পিতার বলার কিছু ছিল না। বলল, 'বেশ, তোর মতেই আমরা সুন্দরী বউ করব। কিন্তু তারা কি দেয় তা দেখব।'

শামসুল অব্যাহতি পেয়ে মনে মনে আনন্দিত হল।

সেদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুদ্ধি মোড়ল রওশনের বাড়ি গিয়েছিল নব-সম্বন্ধ নিয়ে। পরের দিন সাজেদ মন্ডলের বাড়ি এসে ফলাফল পেশ করল। মোড়ল বলল, 'বাপুজী! তোমার ছেলের পছন্দমত বিয়ে দিতে হলে একটি পয়সাও পাবে না।'

সাজেদ মন্ডল ছেলের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, 'কি বলল তারা?'

- ও বাপুজী! তারা কি খুশী না হয়ে থাকতে পারে? এত বড়লোক ঘরে অযাচিতভাবে বিয়ে! একি কম ভাগ্যের কথা? যা মনে হল, ছুঁড়িটা বেশী খুশী। তবে হ্যাঁ বাপুজী! মেয়েটি না অনিন্দ্য সুন্দরী! কিন্তু ঐ টাকার গোলমাল। বলছে, 'এক হাজার টাকার মধ্যে যদি হয়।' তাও আবার জমি বিক্রি করে দেবে। অমত প্রকাশে কত হাতে-পায়ে ধরল। শেষে তো রওশন কেঁদেই ফেলল। বলল, 'গরীবের মেয়েটিকে কোন রকম উদ্ধার করতেই হবে।' কিন্তু দেখ বাপুজী কি করবে।

সাজেদ মন্ডল ক্ষণেক কি চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা মোড়ল সাহেব! ওখানকার বউ কি কালো হতো?'

বৃদ্ধ লাঠি তুলে মাটিতে ঠক্ করে ঠুকে বলে উঠল, 'কে বলল বাপুজী? ওসব মিথ্যে কথা বিয়ে ভাঙানোর জন্যে বলেছে। বউ এক নম্বরের দেখার মত বউ। ঐ রকম ভুয়ো কথা শুনে ঈমান-ধর্ম নষ্ট করবে না বাপুজী। হিংসুকের কথায় কানভারি করে মেঘলা রাতকে অমাবস্যা ভাববে না বাপু।'

অবশেষে তাই হল। শত চেষ্টা করেও শামসুল পূর্ব প্রস্তাবকে রদ্দ করতে পারল না। শেষবারে সে নিজে অন্তিম প্রচেষ্টা চালাবার জন্য রওশন মন্ডলের বাড়িতে উপস্থিত হল। যত রকমের সুরাহা তার মনে উদয় হয়েছিল তার মধ্যে একটা না হলে আর একটা ব্যবহার করবে এই মনোভাব নিয়েই ঠিক বিকালে পৌঁছল। দেখল বাড়িতে একমাত্র বদরু ছাড়া আর কেউ নেই। মুখোমুখী হতেই শামসুল সস্নেহে ডাক দিল, 'বদরু--?'

সুহাসিনী বদরু পূর্বাপেক্ষা বেশী লজ্জাবোধ করছিল। আড়ষ্ট জিহ্বায় কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই শামসুল বলতে লাগল, 'বদরু! তোমার আব্বা-দাদু কেউ নেই? কোথায় গেছে? এখন ফিরবে কি না?'

এক সাথে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে বদরু একটু হাসল। সুনয়নে শামসুলের প্রতি দৃক্পাত করে বলল, 'কেউ নেই, মাঠে গেছে, সন্ধ্যায় ফিরবে।'

মন যাকে চায়, তাকে আরো কাছে পেতে চায়। এই তো বদরুকে কাছে পাওয়ার সর্বশেষ চেষ্টা। কিন্তু তার আশঙ্কিত মন তাকে বারবার নিরাশ করে তুলছিল। ভাবছিল, বদরুর মনোমুগ্ধকর গুণগ্রামের মূল্য হয়তো সে দিতে পারবে না। ক্ষণকাল নীরব থেকে শামসুল বলল, 'বদরু! হাজার দশেক টাকা কোন রকমে সংগ্রহ করে আব্বাকে দিয়ে সন্তুষ্ট কর। পরে আমিই সেই টাকা পুনরায় ফিরিয়ে দেব!'

এ বাক্য শ্রবণে বদরুর দেহ ছম্‌ছম্ করে উঠল। নির্বিচল দেহে বিনা বাক্যব্যয়ে বসে থাকতেই তার নয়ন-যুগল অশ্রুপূর্ণ হল। শুধু দু' ফোঁটা অশ্রুই টপ্‌টপ্ ক'রে মাটিতে পড়ে জবাব দিয়েছিল, 'শামসুল! তুমি ঠক্, ঠক্।'

কে জানে হৃদয়ের খবর? এতদিন তার হৃদয়ের বালুচরে গৃহ নির্মাণের জন্য কত ইষ্টককাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে পাহাড় করেছিল। সেই দেখে তার হৃদয় কত উল্লসিতই না হত। কিন্তু আজ একি হল? এই কি প্রয়োজন মিটানোর সাধনা? টাকা?

কিছু আশা কিছু ভালবাসা দিয়ে তার মনে বাসা বেঁধেছিল চিরসাথী হওয়ার বুলবুল। কিন্তু সেই বাসাকে আজ কোন্ ঝড় উঠে নিশ্চিহ্ন করে দিল? টাকার ঝড়ে?

ইসলামী চরিত্রের রূপরেখার উপর গড়ে ওঠা পুণ্যময়ী মেয়ে ভেবেছিল, স্বামীরূপে কাছে পেলে তাকেও পুণ্যময় বানিয়ে বেহেশ্‌তী সুখ রচনা করবে। কিন্তু সে আশাতে বাধ সাধল টাকার লালসা?

টাকার বিনিময়ে প্রীতি? যুলুম করে প্রেমের বন্ধন? একজনকে কৃপাণাঘাতে ধরাশায়ী করে তার সেই নিঃসৃত শোণিতবিন্দুর সাক্ষাতে যদি বলে যে, 'আমি তোমার প্রতি কৃপাশীল। আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমায় বাসো বন্ধু--' তাহলে ভুলেও বাসবে কি?

বদরুর মনে কথাগুলি গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছিল। মাথানত করে সে নিরুত্তর বসেই রইল। শামসুলও নিতান্ত লজ্জায় ও দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। অবিচ্ছেদ্য এক বন্ধন ছেদন করে সে যে নব-বন্ধন গড়ে তুলতে পারছে না, সে কথা জানাবার জন্য সে এসেছিল। সে চাচ্ছিল, বদরু উত্তর করুক। কিন্তু বদরুর মৌনতাই যে স্পষ্ট উত্তর তাও কি একজন শিক্ষিত ছেলের বুঝতে বাকী ছিল? সে তার অবস্থা অনুমান করে পুনরায় বলল, 'বদরু--!'

বদরু মুখোত্তোলন করে বন্দিনী হরিণীর ন্যায় অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল।

'আব্বা বড় একগুঁয়ে। তাই বলছিলাম, যদি কোন প্রকারে---।' কথাটা শেষ না করেই শামসুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বদরুর প্রতি তাকিয়ে রইল। বদরুর অভ্যন্তরস্থ রিক্ততা ও নিরাশার বেদনা তখন ফুটন্ত পানির ন্যায় ফুলে ফুলে আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আকম্পিত ওষ্ঠাধরে সে জবাব দিতে প্রস্তুত হয়ে বলল, 'দশ হাজার টাকা! কোথায় পাব এত টাকা?

আর আমি আশাও করিনি যে, বড়লোকের বউ হব। আপনি কেন মিছা ছলনায় আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন?'

কথাগুলো বলতে নতুন করে বদরুর নেত্রদ্বয়ে সমুদ্র-জোয়ারের মত পানি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। তারই সমবেদনায় হোক কিংবা বদরু থেকে নিরাশ হওয়ার আত্মগ্লানিতেই হোক শামসুলের বুকে শরবিদ্ধ হতে লাগল। ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমাকে ভুল বুঝো না বদরু! আপাততঃ ব্যবস্থা কর, আমি পরিশোধ করে দেব।'

বদরু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'পাই কোথা?'

- কি করবে তাহলে?

- করার কিছু নেই। আপনি বড়লোক ঘরে বিয়ে করুনগে। আমাদের মত গরীব কন্যা কি বড় ঘরে স্থান পায়?

বলেই বদরু বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা একবার চক্ষুভরা অশ্রুজলকে মুছে নিল। শামসুল উপায় না দেখে ভাবল, সবই ব্যর্থ, সবই দুরাশা, যা মনে করে এসেছিল তা মনেই রয়ে গেল।

কিন্তু সে করবেই বা কি? পিতা যে টাকা ব্যতীত কোনক্রমেই রাযী নয়। আবার জোর সংগ্রাম যদিও বা করে, তবে হয়তো তার বিবাহই স্থগিত থেকে যাবে এবং তার আশানুরূপ কার্যসিদ্ধ হবে না। এবার সে নিজেকে সত্যই ভীরু ভাবল। অনেকানেক সাত-পাঁচ চিন্তার পর বলল, 'বদরু! তাহলে এতদিনের ভালবাসার মূল্যায়ন হবে কিভাবে?'

- মূল্য দেওয়ার জন্য অত টাকা পাচ্ছি কই? আপনার কাছে তার মূল্য তো টাকা।

- ছিঃ! ও রকম কথা বলছ কেন বদরু? আমি কি তোমার কাছে টাকা চেয়েছি?

- না চাইলেও উদ্দেশ্য বিদ্যমান। অন্যথা আব্বাকে মত করাতে পারতেন।

- বহু চেষ্টা করেছি বদরু! বহু রাগ দেখিয়েছি। তোমাকে চিরসাথীরূপে পেতে অনেক ভাবনাই ভেবেছি। যদি তুমি টাকার পথে আমার কাছে না আসতে পার, তাহলে আর একটি শ্রেষ্ঠ পথ আছে। তাতে তুমি সম্মত হবে তো?

- শ্রেষ্ঠ পথ, না ভ্রষ্ট পথ?

তারপর শামসুল সংগোপনে যা বলল তাতে চরিত্রবতী বদরু মুখে শাড়ির আঁচল রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পরিষ্কার ভাষায় সে বলে দিল, ব্যভিচারিণীদের পথ অবলম্বন করার চাইতে মরণ অনেক ভালো।

(১০)

শামসুলের নতুন পৃথিবীর শুভ দিনটি তাকে স্বাগত জানিয়ে গেছে, কিন্তু তার মন থেকে তখনও বিভেদ ঘোচেনি। ওখান হতে ফিরে এসে তার মন যেন আকাশে-

বাতাসে মেঘমালার ধারেপাশে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিল। এখনও তার মনে স্বস্তি নেই, স্থিরতা নেই, সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই। অনেক চেষ্টাও তো করেছে, শেষপথের কথাও সে বদরুকে বলেছে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। ধর্মপরায়ণা তরুণী সেদিন লজ্জায় ও ঘৃণায় ক্রন্দনে বক্ষ ভাসিয়েছিল। তবে তার করার আর কি বাকী ছিল? তাই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় এক আকাঙ্ক্ষিত না পাওয়া জিনিস ছেড়ে দিয়ে নবীনরূপে অন্য এক আশার বাসা নির্মাণ কাজে মনোনিবেশ করল।

বিবাহের দুদিন পর শামসুল ঘটক বুদ্ধি মোড়লের নিকট তার প্রদত্ত বায়নার টাকা ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল। টাকা চাইতেই বৃদ্ধ বলল, 'হ্যাঁ দাদুজী! সে টাকা তো দিয়েই দিয়েছ!'

শামসুল গম্ভীরভাবে বলল, 'দিলেও পানিতে দিইনি মোড়ল।'

- সে কি দাদু! বমি করে কি আবার গিলে নিতে হয়?

- সে বমি আপনিই বা হজম করবেন কেন? তাছাড়া এটা দান নয় সাহেব! মজুরি স্বরূপ আগে দাদন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আপনি যখন কার্য সিদ্ধ করতে পারলেন না, তখন এমনি তো আর টাকাটা ছেড়ে দিতে পারি না। পরিশ্রম না করলে কেউ পারিশ্রমিকের অধিকারী হয় কি?

বৃদ্ধ টাকা ফেরতের কথা শুনে যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। তবুও বুদ্ধির ভাঁড় থেকে এড়িয়ে যাওয়ার মত বুদ্ধি প্রয়োগ করেও যেন নাছোড়-বান্দা শামসুলের কথার ফাঁস কেটে নিজেকে মুক্ত করতে পারছিল না। পুনরায় সে বলল, 'সে টাকা তো ভরে রাখিনি দাদুজী!'

- তবে কি করেছেন শুনি?

- ব্যাঙ্কে, মানে উদর ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছি। আর তো তোলার উপায় নেই দাদু!

- তবে টাকাটা পাব না বুঝি?

- কি করে পাবে? আর তোমার তো জোড়া এনে দিয়েছি।

শামসুল একটু রুষ্ট হল। বলল, 'ওসব চালাকি রাখুন মোড়ল! এ রকম দালালি যার তার কাছে চলবে না। যেমন করেই হোক আমার টাকা দুদিনের মধ্যে ফেরৎ দিতেই হবে। নচেৎ ভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে আপনার অবস্থা টাইট করা হবে!

মিথ্যা হুমকি দিয়েই শামসুল আর দাঁড়াল না। কিন্তু ঘটক বৃদ্ধ পড়ল মহা মুশকিলে। সে ভেবেছিল টাকাটা এমনিতেই তার হয়ে গেল। পক্ষান্তরে এ যে ভীষণ চাপ! তাতে সে নিশ্চিত চোর সেজে বসে আছে। শামসুল তাকে বিয়ের চটকদার ঘটক নয়, বরং সিন্ধুঘোটক মনে করতে শুরু করেছে!

একদিন গত হয়ে গেল। রাত্রি অবসান হলেই শামসুলের আসার দিন হয়ে যাবে। বৃদ্ধ তাই ভাবছিল, তাকে জবাব কি দেবে। যে টাকাটা সে পেয়েছিল, তার উপমায় সে তো

পানির পাত্র চালুনির মত। নিজের ঠাটবাট ও স্ত্রীর শাড়ি-প্রসাধনে পানির মত গড়িয়ে বের হয়ে গেছে। তাছাড়া শেষ জীবনে ঘটকালির মত অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ সৃষ্টি করেই তাদের সংসার চলে। টাকা সে কেন দেবে? মনের বল নিয়েই রাত্রি কাটল। পরদিন শামসুল আর অনর্থক কথা বাড়াতে এল না।

(১১)

এক মাস পরের কথা। শামসুল তখন বদরুর পূর্বানুরাগকে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে দিয়ে স্বীয় স্ত্রীর চরম প্রেমানুরাগে রঞ্জিত হয়েছিল। দাম্পত্যের ব্যবহারে স্বাভাবিকভাবে যে মাধুর্য ও মনোহারিত্ব থাকা প্রয়োজন, তাদের মাঝে এসে গিয়েছিল। স্ত্রীর পাতিব্রত্য দেখে এবং সংসারের নানা কাজের পারিপাট্য ও নিপুণতা লক্ষ্য ক'রে শামসুল অত্যন্ত সুখানুভব করছিল। তার হৃদয়ে যে একজনকে না পাওয়ার দংশন-জ্বালা অনুভূত হচ্ছিল, তা স্ত্রীর সত্যাচরণে উপশমিত হয়ে সুশীতল হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন এমনিই অতিবাহিত হল। স্বামীর মন ভালবাসার গভীরতায় স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করেছিল। কিন্তু স্ত্রীর মনে 'কিন্তু' ছিল, জিজ্ঞাসা চিহ্ন ছিল। সেদিন রাত্রে শামসুল স্ত্রীর মুখ-চুম্বন করে প্রেমের আবেগে বলল, 'প্রিয়তমে! যদি তুমি-আমি একত্রিত না হতাম, তাহলে প্রেমের এই নির্মল সুধা অন্যের কাছে পেতাম কি?'

স্ত্রীর মনে কি যেন উদয় হল। স্বামীর মুখ প্রতি নয়নভরে তাকিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ভালবাসেন?'

শামসুল কিঞ্চিৎ হাস্য করে বলল, 'তোমার বিশ্বাস হয় না? এত বেসেও বাসি না কোথা, ও আমার শীতের কাঁথা!'

স্ত্রী সহাস্য মুখে বলল, 'সত্যিই বাসেন? ও আমার বর্ষার ছাতা!'

শামসুল পাল্টা প্রশ্নের অর্থ বুঝতে না পেরে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বলল, 'তোমার কি সন্দেহ হয়?'

স্ত্রী বলল, 'না তা নয়। তবে আমাকে যদি সত্যই ভালবাসেন, তাহলে একটা কথা বলুন তো, আমাকে এত কেন ভালবাসেন?'

অন্য কিছু বললে হয়তো শামসুল উত্তর দিতে পারত। কিন্তু সহৃদয় জীবন-সঙ্গিনীর 'কেন'র জবাব খুঁজতে তার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। ক্ষণেক নীরব থেকে প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল, 'মানে বুঝতে পারলাম না তো?'

স্ত্রী ভুবনমোহন হাসি হেসে বলল, 'মানে, বলছিলাম যে, আব্বা যদি সাড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা, দশ ভরি সোনা না দিত, তাহলে কি আমাকে ভালবাসতেন? আমি তো ভালবাসা পাওয়ারই যোগ্য। যেহেতু আব্বা হাতের খেলনার মত এতগুলো টাকার বিনিময়ে ভালবাসা আপনার নিকট থেকে আমাকে কিনে দিয়েছে। এবার বুঝলেন?'

শামসুল স্ত্রীর মুখে এত বড় কথা শুনবে, তা কল্পনাই করেনি। নিমেষে উত্তেজিত হয়ে সরে গিয়ে পাশ ফিরে শয়ন করল। রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলে উঠল, 'ওঃ! এত বড় কথা তোমার? মনের মাঝে এত বড় কূট? এর শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। আর একবার রেডিওর জন্য আমি সুন্দর বললে তুমি উত্তর করেছিলে, ওটা তোমার বাপেরই দান! আবার পাঁচশ' টাকা বাড়িয়ে বলে আমার মাথা আরো গরম করলে।'

স্ত্রী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরবে হেসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'না গো আপনি রাগ করলেন কেন? কথায় কথায় এমনিই বলে ফেললাম, তার আবার রাগের কি?'

নিমেষে স্বামীর রাগের তাপমাত্রা নেমে এল। প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল, 'মিথ্যা কথা বললে যে? সাড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছ তোমরা?'

- হ্যাঁ। এটা কিন্তু সুনিশ্চিত। সাড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি নিজের হাতে গুনে দিয়েছি।

ব্যাপারটা শামসুলের সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হল। মুহূর্তের মধ্যে যত রাগ গিয়ে পড়ল বৃদ্ধ বুদ্ধি মোড়লের ঘাড়ে। কারণ বৃদ্ধ তখন ঘুসের কথা অস্বীকার করছিল। সকালে উঠে তার ব্যবস্থা কি করবে তাই ভাবতে লাগল। অতঃপর শয্যাসঙ্গিনীর পরম পরশে হঠাৎ কখন তার কোল ছেড়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে চাইলে পিতা বলল, পঞ্চাশ হাজারের বেশী একটি পয়সাও পায়নি। তাই শামসুল যেন মোড়ল ঘটকের উপর রাগে অধীর হয়ে এর কৈফিয়ত তলব করতে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হল।

অপুত্রক মোড়ল তখন পরধনে অর্জিত সুখদ সামগ্রীর বিশাল-সিন্ধুর মাঝে সন্তরণে লিপ্ত ছিল। হঠাৎ শামসুলকে ত্রস্তপদে বাড়ি প্রবেশ করতে দেখে সে হতচকিত হয়ে গেল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। কৈফিয়তের বেড়াজাল কোন রকম এড়িয়ে পুনরায় বৃদ্ধার সাথে রসালাপে নিমগ্ন হল। তবে তার মনে একটু ভয় হল, যখন শামসুল তাকে পুলিশের ভয় দেখাল।

পরবর্তীতে যখন শামসুল বুদ্ধিমোড়লের বাড়ি এল, তখন বাইরে থেকেই সে শুনতে পেল বৃদ্ধার গুন্‌গুন্‌ স্বরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নার শব্দ, 'ও আমার সাত কোদালের মুনিষ গো! ও আমার সাতরাজার মানিক গো! ও আমার পোড়া কপাল গো!'

(১২)

বদরুন্নিসাকে যে হাওয়া শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার বাঞ্ছিত গন্তব্যস্থানের দিকে, সেই হাওয়া আজ হঠাৎ তাকে সেই শূন্য থেকেই ছেড়ে দিল। যেদিনে শামসুলের বিবাহ-

সংবাদ তার কানে পৌঁছল সেদিন তার মর্মে যেন পীড়া হানল। কিন্তু এ পীড়া তাকে না পাওয়ার জন্য নয়; বরং পিতার মুখের প্রতি তাকাতে তার মনচাপা দুঃখের অন্তর্বাষ্প উপচে উপচে উঠছিল। কেমন করে যে পিতা এহেন শৃঙ্খল হতে নিষ্কৃতি পাবে, মহান প্রভুর এই ধূলির ধরায় ইসলামের মৌলিক অর্থে 'শান্তি'র ধর্মের মানুষের অহর্নিশ অহমিকায় দুর্বল শোষণের মাধ্যমে উপরে ওঠার ফিকিরে পাতা ফাঁদ হতে কোন্ উপায়ে উদ্ধার হবে, তাঁর এই বিশ্বচরাচরে পানির পথে মাছের পথিক 'আড়া'কে কিভাবে এড়িয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে - এই সব চিন্তায় তার নির্মল হৃদয় চিন্তাহ্রদে পরিণত হয়ে উঠল।

পিতা-পিতামহ দিনের দিন যেন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। কোন উপায়ে একটিমাত্র কন্যাকে সুপাত্রস্থ করে তারা তার সুখময় জীবন আর দেখতে পারল না। কত চেষ্টা শত বিপদে করেও কোন একটা কূল-কিনারায় উপনীত হতে পারল না। এ সমাজে দরিদ্র কত অসহায়! কত হতভাগা! কত অক্ষম!

বিকাল বেলায় বদরু রান্না চড়িয়েছিল। ইন্ধন গিয়েছিল আকাশের ঝিমঝিম বৃষ্টিতে ভিজে। যখন সে উনুন ধরাতে গিয়েছিল, তখনই সে মনে করেছিল এ কাষ্ঠ জ্বলবে না। তবুও চেষ্টা করল জ্বালাবার জন্য। কিন্তু নাঃ, জ্বললই না। একবার-দু'বার নয় প্রায় শতবার ফুঁ দিয়ে তার মাথা ভার হয়ে গেল, তবুও ধুঁয়া ভিন্ন অগ্নিশিখা বের করতে পারল না। যত সে ধুঁয়াকে দূরীভূত করার চেষ্টা করে, তত ধুঁয়া তাকে অন্ধ ক'রে দেয়।

পিতামহ তখন ঘরেই ছিল। কক্ষ থেকেই বলল, 'ও মা বদরু! একটু কেরোসিন ঢেলে দাও না।'

কিন্তু ঘরে কেরোসিনও তো নেই। পরিশেষে বদরু পরাজিতা হল। কি জানি? ধুঁয়ার কারণে, নাকি কোন অজানা দুঃখ গোপনে তার বুকে ধাক্কা দিয়েছে বলে তার চক্ষু হতে পানি গড়াতে লাগল। কারণ, যেমন করে শতবার ফুঁ দিয়েও সে উনুন ধরাতে পারল না, ঠিক তেমনি করেই যে তার পিতা-পিতামহ তার বিবাহের জন্য কত উপায়ের উপর চেষ্টার ফুঁ লাগিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ কোনক্রমেই সে পরিণয়ের প্রদীপ্ত জ্যোতি জ্বলে উঠেনি। সকলেই তার পিতামহের মত কেরোসিন দিতে বলেছে। কিন্তু তারা সে টাকার কেরোসিন পাবে কোথায়?

নিশীথিনী যখন তার কৃষ্ণ প্রলেপ নিয়ে দগ্ধ মনের মানুষকে প্রশান্তি দিতে এল সকলের দ্বারে, তখন বদরুরও সে প্রলেপ পাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তার মনে কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হল না। তার মন প্রায় সকল সময়েই সকল প্রলেপকে অগ্রাহ্য ক'রে যেন আশীবিষ দংশনজনিত যন্ত্রণাতিশয্যে কাতর থাকে। তাহলে সে প্রলেপ প্রশান্তি আনয়ন ক'রে তার মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে কেমন ক'রে? সংসার চিন্তা এবং সেই সাথে তার নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তার বাহ্যিক পৃথিবী যেন সকল রঙ-রূপ হারিয়ে ফেলেছে। শত সৌন্দর্যের শোভাময় প্রকৃতি যেন তার কাছে মরীচিকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। পিতার কষ্ট দু' চোখে দেখে তার কচি-কোমল হৃদয় যেন চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। তাই নিশুতি রাতেও তাকে ভাবতে হয়, কেন সে মেয়ে হয়ে এ মরুময় পৃথিবীর নিষ্করুণ সমাজে জন্ম নিয়েছিল? যদি সে ছেলে হয়ে জন্ম নিত, তাহলে এতদিন পিতা-পিতামহের দোসর হয়ে তাদের দুঃখ ও দারিদ্র্য মোচনে প্রয়াসী হত। আর কেনই-বা হতভাগীর জন্ম এই 'নাই-নাই'-এর সংসারে হল? এ সব কথা মনে আসে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করে না। কারণ সে জানে এতেই তার মঙ্গল আছে। তবে এমন ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সে তাঁর কাছে নিয়মিত প্রার্থনা করে। আর বিবাহ? বিবাহ তার না হলেও চলত। নারী জীবনের সবচেয়ে বড় আশা, চাওয়া ও পাওয়া হল একটি মনোমতো স্বামী। বিবাহ ঈমানের অর্ধাংশ এবং নারী-জীবনের একটি অবলম্বন জরুরী বলেই তাকে বিবাহ করতে হবে। নচেৎ শুধু পিতা-পিতামহের চিন্তা দূরীকরণার্থে তার মত মেয়ের বিবাহ না হলেও সুখে কালাতিপাত হত।

কিন্তু আবহমান কাল ধরে নারী এত অবহেলিতা কেন? তারা এমন অপদার্থ কি করে হল যে, তাদেরকে টাকা দিয়ে বিক্রি করতে হবে? সুখের ফুল ফুটাতে পরাগ-মিলনে এত নিপীড়ন কেন? যে বিধি-নিয়মে দুটি স্বর্ণখন্ড গলে একীভূত হয়ে গহনা আকারে নারীর অঙ্গের শোভাবর্ধন করে, ঠিক সেই সময় হাতুড়ির আঘাত স্বর্ণকারের না মেরে কর্মকারের মারে, তাহলে গহনার গঠন-প্রকৃতি ব্যবহারযোগ্য হবে কি?

নারী পুরুষ সমাজে বিনিন্দিতা। কন্যাসন্তান কোন উপকারে আসে না। বড় হলেই বিয়ে দিয়ে পরের ঘর বিদায় করতে হয়। আর সেই বিদায়ের সময় অনেককে পথের ভিখারী হতে হয়। প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধের সময় নারী কোন কাজে আসে না। পরন্তু অনেক ক্ষেত্রে নারীঘঠিত কলঙ্ক সমাজে অধিকরূপে অমার্জনীয় অপরাধ।

পক্ষান্তরে পুরুষ আর একটা দিক ভুলে বসে। নারীর পায়ের তলায় তার বেহেশ্ত। নারী তার জীবন-সঙ্গিনী। যে তার সাথী না হলে তার জীবন উত্তপ্ত মরুময়। জ্বালাময় জীবনের সুশীতল বাতাস এই নারী। তবে শুধু স্বার্থপরতা নয় কি?

অবশ্য এই স্বার্থপরতায় নারীও শামিল। নারীও অনেক সময় নারীকে পছন্দ করে না।

ইসলাম-প্রাক্কালে আরব জাহেলিয়াতের পাষন্ডেরা নারী হত্যা করত। সদ্যঃপ্রসূত জীবন্ত শিশুকন্যাকে ভূপ্রোথিত করত। আপন ঔরসজাত কন্যাকে তারা কোন্ হৃদয় নিয়ে মরুতলে দাফন করত? কেমন করে তারা আপন নয়নমণিকে তরবারি দ্বারা দ্বিখন্ডিত করে সমুদ্র-সলিলে নিক্ষেপ করত? তাদের কোন্ অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড?

জনৈক স্বামী যখন বাণিজ্যে যায় স্ত্রী তখন গর্ভবতী। কেন কে জানে? যাবার সময় সে

বলে গেল, দেখ প্রেয়সী! আমাদের ভাগ্যাকাশে যদি সূর্যোদয় হয়ে পুত্র-সন্তান জন্মলাভ করে, তাহলে সুন্দরভাবে লালন-পালন তথা সময়ে সুশিক্ষা দান করবে। যাতে ফিরে এসে আমি পুত্রের মুখচন্দ্রিমা দর্শন করে চক্ষু শীতল করতে পারি। আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কন্যা-সন্তান জন্ম নেয়, তাহলে গ্লানি দূর করার জন্য মরুতলে তার ইহলীলা সাঙ্গ করো। এসে যেন তার কু-মুখ দেখতে এবং লোক সমাজে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে না হয়!

কিন্তু অপরাধ কি? ধূলির ধরায় পিতার ক্রোড়ে তাদের কি থাকার অধিকার নেই? তারা কি পিতা-মাতার ক্রোড়ে শোভাবর্ধন করতে পারে না? তারা এমনই কুলক্ষণা যে, তাদের মুখ দেখাতেই সংসারে অনিষ্ট সাধন হয়? তাহলে বংশ-বৃদ্ধি ও পুরুষের শ্রীবৃদ্ধি কিরূপে হবে? তারাও কি বদরুর পিতার মত দরিদ্র ছিল, তাই বিবাহ দেওয়ার ভয়ে পূর্ব হতেই 'না রহে বাঁশ, না বাজে বাঁশরী'র নীতি অবলম্বন করত?

অনন্তর স্ত্রী যখন যথাসময়ে এক নয়নাভিরাম কন্যাসন্তান প্রসব করল, তখন দেখা দিল সমস্যা। এখন সে স্ত্রী হয়ে স্বামীর আদেশ পালন করবে, নাকি জননী হয়ে শিশুকন্যার জীবন রক্ষা করবে? কচি শিশুকন্যার মিষ্টি মুখ দর্শনে জননীর মন অনুকম্পায় ভরে উঠল। অমাবস্যার পর পশ্চিমাকাশে যেমন সূক্ষ্ম সুদর্শন শশধর উদিত হয়, ঠিক তদ্‌সদৃশ শিশুকন্যাকে হত্যা করা তো দূরের কথা, তাকে কোলে তুলে হাজার প্রাণঢালা স্নেহবারি বর্ষণ করতে লাগল তার উপর। সুন্দর পুষ্পপ্রতিম মুখচ্ছবি ও তার হাস্যময় লীলাচঞ্চল শ্রী দেখে মুখের কাছে তুলে বারবার চুম্বন দিতে লাগল। মাতৃপ্রকৃতির মন বলে উঠল, কেন তাকে হত্যা করবে? যার কোন দোষ নেই, যে মাসূম নিষ্পাপ শিশু। যে জীবনের সাধ, নয়নপুত্তলি, তনুনিঃসৃত শোণিতাংশ। তাকে কোন্ স্বার্থে বা অপরাধে ভূমিস্থ করবে? কে জানে ভবিষ্যতে সে পিতামাতার মানহানি অথবা মানবর্ধনের কারণ হবে? ভাবল, স্বামী ফিরে এলে যথাসময়ে বাহানা খোঁজা যাবে।

বহুদিন পর স্বামীর নিকট হতে তার বাণিজ্য-সফর থেকে প্রত্যাগমনের সংবাদ নিয়ে একটি পত্র এল। এক্ষণে সতী হয়ে পতির কথা অবমাননা করার অপরাধের কারণে নিজ জীবনাশঙ্কায় অন্তর কেঁপে উঠল। বহু মঙ্গলামঙ্গল ভাবা-চিন্তার পর মহাত্রাসে ও অতি সন্তর্পণে মেয়েটিকে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হল।

স্বামী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সম্বন্ধে জানতে চাইলে স্ত্রী ম্লান মুখে সকাতরে জবাব দিল, মেয়েই হয়েছিল। সে তাকে হত্যা করে স্বামীর আদেশ পালন করেছে।

সংবাদ শুনে স্বামী খুশী হল। আপদ গেছে আর কি? কিন্তু নিজ সন্তান-বলিতে খুশী হওয়ার মত লোক আজকের এই আধুনিক বিশ্বেও আছে কি? আছে বৈকি?

আরো অনেকদিন অতিবাহিত হল। একদিন সেই বালিকা মায়ের বাড়ি এসে মাকে সাক্ষাৎ করতে এল। কিন্তু সে চঞ্চলমতি সুনয়না নিজ পিতার চক্ষু হতে নিজেকে গোপন করতে পারল না। পিতার নজরে পড়তেই তার মনটা ধক্ করে উঠল! মৃগনয়নার বঙ্কিম চাহনি, কৈশোরের অদম্য চাপল্য, রজতসদৃশ দন্তপাটির সুমিষ্ট হাসি এবং কাঁচা কাঞ্চন সদৃশ দৈহিক লাবণ্য তাকে যেন নিমেষে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। তার সেই মদিরাক্ষীর মোহনীয় দৃষ্টি অজ্ঞাতপরিচয় পিতার মনকে অজান্তে চুরি করে নিল!

মাতা কন্যাকে সাবধান করল বটে, কিন্তু তার চাপল্য তা উল্লংঘন করল। একদা হঠাৎ স্বামী স্ত্রীকে বলল, 'মোহিনী মেয়েটি কার? এরূপ যথার্থরূপী মেয়েকে বিবাহ করতে তোমার অনুমতি হবে কি?!'

এ্যাঁ! কেন? রূপোন্মত্ত হতভাগ্য নর! তোমার এই সুবিচার? যাকে কাল খুন করতে বলেছিলে, তাকেই আজ প্রাণ-প্রিয়া বানাতে চাও? যাকে বাঁচিয়ে রাখলে তোমার মান ও যশের বিশেষ ক্ষতি হয়, তাকে পেয়ে তোমার জীবন ধন্য করতে চাও? খেয়াল ক'রে দেখ হে বীর! তোমার মাথার উপর লজ্জার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে! এটা কি তোমার অবিচার নয়? তুমি যে সামাজিক জীব, তুমি যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি!

স্ত্রী তখন হতবাক নিরুত্তর! গত্যন্তর না দেখে কুলের কথা তখন খুলে বলতেই বাধ্য হল। স্বামী বজ্রকণ্ঠে বলে উঠল, 'নাফরমান নারীজাত! তুমি আদেশ বাইরে কাজ করে বসে আছ? কঠোর শাস্তি পাবে তুমি। কেন তাকে সেদিন মেরে ফেলনি?

এবারে স্ত্রীর আঁখিযুগল অশ্রুজলে ঝলমল করে উঠল। কিয়ৎক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলল, 'দেখুন স্বামী! যে কারণে আপনি তাকে বিবাহ করার আশা ব্যক্ত করেছেন, আমিও প্রায় একই কারণে তাকে সেদিন হত্যা করতে পারিনি।'

যুক্তির ফাঁদে পড়ে স্বামী স্ত্রীকে শাস্তি থেকে রেহাই দিল। কিন্তু কোন গুপ্ত হিংসার দাগ তার মনের মাঝে রয়েই গেল।

অনন্তর স্ত্রী স্বামীর হৃদয়-গতি অনুকূল দেখলে মেয়েকে ঘরেই ফিরিয়ে আনল। মেয়ে পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসার যেন উচিত অধিকারিণী হল।

কিন্তু কিছুদিন পর আত্মগ্লানির গুপ্ত তুষের আগুন যেন পিতার মনে ধূমায়িত হয়ে উঠল। সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ঘরে মেয়ে রাখাকে চরম মানহানির কারণ ভেবে এক ছলনা তার মনে আশ্রয় নিল।

একদিন স্ত্রীকে বলল, 'আজ নিমন্ত্রণ খেতে যাব পার্শ্বের গ্রামে। একা না গিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে গেলে কিছু খেয়ে আসত। একটু ভালো ক'রে সাজিয়ে দাও তো।'

নির্বিঘ্নে কয়েকটা বছর যখন পার হয়ে গেছে, তখন আর সন্দেহের কি আছে? তাই ললনার মন ছলনার কথা আঁচ করতে না পেরে স্বামীর কথা মত মেয়েকে সুসজ্জিতা ক'রে পিতার সাথে পাঠিয়ে দিল নিমন্ত্রণ খেতে।

কিন্তু হায়! কোথায় নিমন্ত্রণ? কতদূর সে গ্রাম? বিস্তৃত মরুভূমির ধুধুময় প্রান্তরে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর চলতে চলতে সেই বালিকার কচি কচি পা দুটিতে যেন ফোস্কা পড়ে যেতে লাগল। তার উপর দিবাকরের আগুন ঢালা ধুপ এবং মরুর তপ্ত লু হাওয়া যেন তার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করছিল। তবুও চন্দ্রাননী কোমলাঙ্গী পিতার সাথে নিমন্ত্রণ খাওয়ার লালসায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেসব কষ্ট ও অসুবিধার কথা প্রকাশ করতেও দ্বিধা করল।

কিন্তু নাঃ ! আর পারা যায় না। নির্দয়-নিষ্ঠুর পিতা সেই ধুধু প্রান্তর দিয়েই পথ অতিক্রম ক'রতে লাগল। বালিকা তখন অধৈর্য হয়ে টেনে টেনে বলল, 'আব্বা! আমাকে পিয়াস লেগেছে।'

পাষাণপ্রাণের পিতা বড় স্নেহমাখা বাক্যে উত্তর করল, 'চল্ মা! আর একটু। ঐ চলে এসেছি।'

কিন্তু চলা-পথের শেষ কোথায়? তারা কোথায় চলেছে? নিরুদ্দেশ পথ বুঝে কন্যা পুনরায় সকাতরে কোকিলকণ্ঠে বলে উঠল, 'আব্বা! পানি--। চরম পিয়াস লেগেছে।'

পিতা সেইভাবেই উত্তর করল, 'আর খানিক।'

বালিকা কোমল পদে তপ্ত বালুকায় আর হাঁটতে পারল না। থপ্ ক'রে বসে গিয়ে বলল, 'আমি আর হাঁটতে পারছি না। আর কদ্দূর আব্বা?'

আত্মমর্যাদায় গর্বিত পিতা আবার স্নেহস্বরেই বলল, 'আর বেশী দূর নয় মা! ঐ যে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে, ঐ গ্রামটা।'

কিন্তু কোন্ গ্রাম? চারি দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকার পর্বত ছাড়া কোন গ্রামই তো নেই। বালিকা মহাকষ্টে উঠে পুনরায় ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙতে লাগলে আবার বলল, 'আব্বা আর কদ্দূর? পানি না পেলে মরে যাব।'

পিতা মনে মনে বলল, 'হতভাগী! তোকে মারতেই তো এনেছি।' প্রকাশ্যে বলল, 'চল! ঐ যে ওখানে একটা কুয়া আছে, ওখানে পানি পাওয়া যাবে।'

পানির লোভে বালিকা একটু শীঘ্র পদক্ষেপে হাঁটতে লাগল। তার মনে হল, যদি সে ছোট হত, তাহলে এত কষ্ট হয়তো তার হত না। পিতাকে কোলে নিতে বললেই তুলে নিত।

যেতে যেতে বাপের মন যেন কোন্ তাপে গরম হয়ে উঠছে বলে মনে হল। আকাশের মেঘ যেমন ক্রমে ক্রমে জমে ঘন কালো হয়ে গর্জন শুরু করে, তার মনের আকাশেও সেইরূপ দেখা দিল। কিন্তু কন্যা সে কথা বুঝেও নিরাশ হল না। 'আব্বা! আর কদ্দূর? আর কদ্দূর?' বলতে বলতে, নাকে কাঁদতে কাঁদতে, আহা! সে বালিকা কোন রকমে পিতার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে একটি কূপের নিকট উপস্থিত হল।

বালিকাটি সেই থেকেই তো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে ফেলেছিল। পানির জন্য বোধ হয় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছিল। তার রসনা যেন রস হারিয়ে তালুর সাথে লেগে গিয়েছিল। গলার ভিতরে আমতা আমতা করে বলল, 'আব্বা! পানি দাও। আর যে পারি না!'

এইটুকু বলতেই তার জিহ্বা যেন মুখগহ্বর হতে বের হতে চাচ্ছিল। এই অবস্থায় সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর পিতার মুখের দিকে তাকিয়েই ছিল।

নির্দয় পিতা বলল, 'দেখছিস্ তো বালতি নেই। কি করব? দেখ্ না পানি বহু দূরে রয়েছে।'

পিতার এহেন হতাশাব্যঞ্জক বাক্যে বিচলিতা হয়ে কিশোরী পানি কদ্দূরে আছে যেমনি দেখতে গেল, আর অমনি হৃদয়হীন পিতা হিংস্র জন্তুর মত তাকে ধাক্কা দিয়ে সেই কূপের অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করল! আহা! সেই সুকোমল দেহ কূপের পার্শ্বস্থিত প্রস্তরে প্রতিহত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। কূপের পানিতে তলিয়ে গিয়ে কিছু পরে প্রয়োজনাতীত পানি পান করে ভেসে উঠল। আকুল ক্রন্দনে পিতার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, 'আব্বা! আমার অন্যায়? পানি চেয়েছিলাম তাই? এটা এত বড় অন্যায় ছিল যে, তার শাস্তি এই তিমির কূপের অতল পানি? আব্বা আমাকে বাঁচাও।'

পিতা দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে বলল, 'পানি খা।'

আঘাতের উপর এ বিদ্রূপের শর! কিশোরী জীবনের আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হল। পিতার এই নিষ্ঠুরতার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে আকুল আর্তনাদে কূপটিকে সে যেন কোন নরককূপে পরিণত করেছিল। আহা! তার সেই ক্রন্দনরোলের সুরে সুর মিলিয়ে যেন কূপটাও কাঁদছিল। কিন্তু নির্দয় পিতার অন্তরে কোন প্রভাব ছিল না, অথচ এমন সুকান্তা বালিকার সঙ্কট-মুহূর্তের ঐরূপ মর্মস্পর্শী ক্রন্দনধ্বনি শুনলে পাষাণও কেঁদে উঠবে।

পাষন্ড পিতা মেয়েটির দিকে আর না তাকিয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হল। হঠাৎ তার মনে ইউসুফ নবীর কুঁয়ো থেকে মুক্তি পেয়ে রাজা হওয়ার কথা স্মরণ হল। অনুরূপ যদি কোন কাফেলা সুন্দরী কিশোরীকে তুলে নিয়ে কোথাও বিক্রি করে তাহলে? সেই ভেবে সেখানে পড়ে থাকা বড় একটা পাথর নিয়ে তার মস্তক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। তাতে বালিকার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। শোণিতধারায় কূপোদক রক্তিম হয়ে উঠল।

এবার পিতার যেন সৎকার্য সাধন হল। মনে মনে চরম সফলতার আনন্দ উপভোগ করতে করতে বাড়ির পথে পাড়ি দিল। কন্যা-হত্যা করে সে যেন তার জীবনের কোন গুরুভার থেকে চিরতরে মুক্তি পেল। মেয়ের পিতা হয়ে তার কালো মুখ যেন সমাজে এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল!

কেমন সে মানুষ? কেমন সে পিতা? নিজের ঔরসজাত কন্যাকে বলি দিয়ে সমাজ-দেবতার পূজা তোমার? তোমার হৃদয় কি পাষাণ-নির্মিত, নাকি তুমি হৃদয়হীন?

বদরু বেদনাহত মন ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন নিয়ে চিন্তাই করছিল। চিন্তা করছিল এই

সকল কথা স্মরণ করে। খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল সে দিনের আর এ দিনের মাঝে পার্থক্য কতটুক।

এ নবীর উম্মত কি জানে না যে, “যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করবে।”

“যে ব্যক্তি একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যারা জাহান্নাম থেকে পর্দা স্বরূপ হবে।”

এমনি করে কখন রাত্রি গভীর হয়েছে তার খেয়াল নেই। পরক্ষণে তার মনের অবচেতনে কখন সে নিদ্রাভিভূতা হয়ে পড়েছে তাও তার অজানা।

(১৩)

পিতার আশা আজ পর্যন্ত পূর্ণ হল না। মনের আশা মনেই পুঞ্জীভূত হয়ে পাহাড় সৃষ্টি করল। আর সেই পাহাড়ের চূড়া হতে নিরাশ নদী প্রবাহিত হয়ে হা-হুতাশের অশ্রুবারি বয়ে যেতে লাগল। কোথাও সন্ধান মিলল না একটি মনোমতো বরের। মনোমতো হলে পণমতো হয় না। যৌতুক দিতে পারবে না বললে, লোকে কৌতুক করে। কোথাও বঞ্চিত ও বেদনাহত হৃদয়ের গরীবের আঁখিজল আঁচলে মোচন না করলেও ফিরে একবার তাকিয়ে দেখার মত মানুষেরও সন্ধান পাওয়া গেল না।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে গরীব করেছ, তার কোন অভিযোগ নেই। যার সংসার একদিন স্বর্ণনির্মিত ছিল, তার সংসারকে সিন্ধুর অতল তলে তলিয়ে দিয়েছ, তাতেও কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এই ‘রোজ আনা রোজ খাওয়া’র সংসারে তার জীবনে বেঁচে থাকার সার্থকতা শুধুমাত্র কন্যা বিদায় করতে পারলেই যে পূর্ণ হয়ে যায়। পাঁচটা নয়, দুটো নয়; মাত্র একটি আদুরী মাতৃহারা কন্যার বিবাহ সুসম্পন্ন করতে না পারলে তার ইহজগতে কন্যার পিতারূপে জন্ম নেওয়ার অর্থ কি? জীবনের সাধ যা ছিল, সুখে-দুঃখে তা মিটেই গেছে। যত সুখ ছিল, উপভোগ করেই নিয়েছে। আবার কি সুখ?

এখন অবশিষ্ট শুধু কন্যার সংসার সুখ। একমাত্র উত্তরাধিকারিণী কন্যার কমপক্ষে সুখের পথ সুগম ও প্রশস্ত ক’রে তার জীবনের আলোটুকু নির্বাপিত হোক - এটাই তার শেষ বাঞ্ছিত সুখ। উপযুক্ত পাত্রদানে তার অন্তরকে হর্ষোৎফুল্ল করতে পারলে, তবেই তো সে গর্বভরে দেখবে তার চরিত্রবতী কন্যার ব্যবহারে ধর্মশীলতা এবং সেই অনুযায়ী তার আচার-আচরণ। লক্ষ্য করবে তার সংসার-জীবনের নানারূপ সফলতা। আর সে মহান আল্লাহর দরবারে ভিক্ষা করবে পিতার জন্য অনন্ত সুখ বেহেশ্‌ত। গরীবের মেয়ে হয়ে যদি সুখে স্বামীর সংসারে দু’ মুঠো অন্ন পায়, তাহলে তা দেখে পিতার মরণ হবে সুখের মরণ। মেয়েকে সুপাত্রস্থ করতে পারলে তবেই পিতার জীবন সফল হবে এবং সুগম হবে পরকালে অব্যাহতি লাভের পথ।

কিন্তু কোথায় সে সুপাত্র? কোথায় সে পুণ্যবান প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, যে নিজের সুখের অংশী অপরকে ক’রে সুখবৃদ্ধি করে এবং অপরের দুঃখে শরীক হয়ে তার দুঃখ লাঘব করে? কোথায় সেই উদার মনের মহানুভব মানুষ, যে সমাজের অবস্থা পরিদর্শন করে অন্যায় দূর করার জন্য সংগ্রাম করে?

যৌতুক ও পণপ্রথার কুপ্রভাবে সমাজে আরো কত পাপ সংঘটিত হচ্ছে। কত বধূ-নির্যাতন, বধূ-হত্যা এবং কত বধূর আত্মহত্যা করার মত ঘটনা ঘটছে এই পণ-অভিশাপের নোংরা প্রভাবে।

পণের ছোবল থেকে বাঁচার জন্য অনেক চালাক মেয়ের বাবাই মেয়ে বড় হওয়ার আগেই সূদে টাকা খাটিয়ে মোটা টাকা করে রাখছে। বিয়াই-জামাইকে সূদের টাকা পণ দিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা এবং লোহা দিয়ে লোহা কাটার চাতুর্য প্রয়োগ করছে। তাদের কথা হল, ‘হারামের মাল হারামেই যাক, হারামের মাল হারামখোরেই খাক!’

কত মেয়ের বাবা কন্যাদায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মসজিদে মসজিদে, দ্বারে দ্বারে হাত পেতে অর্থ সঞ্চয় করছে বর ও তার বাবার ঝুলি ভরার জন্য!

আহা! কত গরীব সুকন্যা বিবাহের প্রত্যাশা করতে করতে বিবাহ-বয়স অতিক্রম করে যৌবনের আশা-কামনা সবই বিলীন করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। কোনমতেই পাপ-লিপ্সাতে লিপ্ত না হয়ে নিজ গরীবী অবস্থার উপর বড় ধৈর্যের সাথে যৌবন কাটিয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে। পক্ষান্তরে কত যুবতী যৌতুক-শাপে অভিশপ্তা হয়ে অনূঢ়া থেকে যৌবনাগ্নির সর্বনাশী দাবদাহে বাধ্য হচ্ছে পাপ পথে তা নিবৃত্ত করতে। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, প্রবহমান কিছু চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে সে থেমে যায় না, বরং অন্য পথ সে খুলে নেয়। পবিত্র প্রেম ও মিলন প্রতিহত হলে অপবিত্র প্রেম ও ব্যভিচারের পথ অনায়াসেই উন্মুক্ত হয়। অবৈধ বিবাহ বাড়ে, জারজ সন্তান জন্মলাভ করে। জীবনের সহায়-সম্বল কেউ না হলে জীবিকা নির্বাহের জন্য ধৃষ্ট নারী নিকৃষ্ট বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে বসে! পানির মত বয়ে চলে সেই সকল বেশ্যাদের যৌবন-নদী। যে যত পারে পান করে ঐ লম্পটের দল দিবানিশি নিরবধি। বাধে না তাদের টাকা-পয়সায়, বাধে না তাদের ধর্মে, বাধে না তাদের চরিত্রে, বাধে না তাদের সমাজের চার চক্ষুতে! সুশৃঙ্খল সমাজের মান-ইজ্জতে তখন কুঠারাঘাত হয় না! বরং সমাজের আধুনিকতার রঙিন কাঁচের প্রতিচক্ষু তখন চক্ষু-দৃষ্টিকে গোপন করে!

প্রশ্ন হয়, যে মেয়ে টাকার অভাবে বিবাহিতা না হতে পেরে যৌন-পিপাসার চিত্ত-চাঞ্চল্য

নিবৃত্তিকরণের উদ্দেশ্যে সে যদি ব্যভিচারিণী হয় কিংবা বেশ্যাখানা খুলে বসে, তাহলে এত বড় পাপের জমা স্তূপ ও পরে পরেই পাহাড় কি ঐ সমাজের ঘাড়ে, বরের বাবার মাথায়, যারা টাকার লোভে গরীব উদ্ধার না করে ঠেলে দেয় পাপের বন্যায় এবং বেশী টাকা আসার আশায় ছেলের বিয়ে না দিয়ে তার যৌন-জ্বালাকে তীব্র থেকে তীব্রতর ক'রে তাদেরকে ঐ শ্রেণীর ব্যভিচার বা বেশ্যাসক্তির পথে পা বাড়াতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করে, তাদের ঘাড়ে ও মাথায় চাপবে না কি?

সেদিন প্রতিবেশীর এক ছেলে গল্প করছিল। বদরুর পিতা তা শুনে মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিল। ছেলেটি বলতে লাগল, তখন আমি ছিলাম স্কুলে। টিফিনের সময়। হঠাৎ মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি লোকের হৈচৈ। আমার কৌতুহল বেড়ে উঠল ব্যাপার জানার জন্য। ছুট দিলাম সেদিকে। গিয়ে দেখলাম, ধান ক্ষেতের আলে একজন বিবাহিতা মহিলা, তার সামনে এক বস্তা ঘাস। বুঝতে পারলাম, মহিলাটি গরীব; ঘাস কাটতে এসেছিল। ব্যাপার এই যে, ও পাড়ার মতোয়াল্লীর ছেলে জোরপূর্বক মেয়েটির শ্লীলতাহানি করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে ইজ্জত বাঁচানোর জন্য চিৎকার করলে এই অবস্থা! এ খবর শুনে এক এক জনে এক এক রকম মন্তব্য শুরু করছিল। যে দেশে আইনের সাহায্য নিয়ে ছাগলের দায়ে গরু বিকিয়ে যায়, সে দেশে আম জন-সাধারণের গণ-আইন চলে। গণ-আদালতে লোক অনুপাতে বিচার কখনো গরম হয়, কখনো নরম। খবর যায় মতোয়াল্লীর কাছে। মতোয়াল্লীর ছেলে; যিনি গ্রামের মাথা। একি কম অপমানের কথা? কিছুক্ষণ পরে মতোয়াল্লী রাগে অধীর হয়ে বিড়বিড় করতে করতে এক পা জমির আলে এক পা জমির কাদায় ফেলতে ফেলতে দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। কারো কাছে না দাঁড়িয়ে এবং কারো কথায় কর্ণপাত করার আগে সোজা সুপুত্রের নিকট গিয়ে ঠিক তার কোমরে বেশ সজোরে একটি লাথি মারলেন। হয়তো বা মতোয়াল্লীর ছেলে বলেই, নচেৎ এতক্ষণ গণ-ধোলাই শুরু হয়ে যেত। আর তারই ধাক্কা সামালতে তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। আর সেই সাথে মুখে নানা রকম ভর্ৎসনা ও তিরস্কার শুরু করে দিলেন। 'শয়তান, পাপিষ্ঠ! তুই আমার অপমান করলি। তুই আমার মাথায় জুতো মারলি। তোকে একশ' কোঁড়া মারা উচিত---।'

আমি মনে মনে হাসছিলাম। যতই হোক আমি কিছু বলার উপযুক্ত নই। মনে মনে বললাম, 'গাছের গোড়া কেটে ডগায় পানি ঢেলে আর কি হবে? ছেলের বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কমসে কম পাঁচ বছর আগে। কিন্তু তিনি উপযুক্ত পণ পাননি, তাই বিয়ে দেননি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, বাছুর গরু বলদ ক'রে বিক্রি করলে দাম বেশী হবে। কিন্তু তাঁর হয়তো জানা অথবা পরোয়া ছিল না যে, বাছুর গরুকে খাসি না করলে ষাঁড় হয়ে তার আচরণ কি হতে পারে। ভাবলাম, শয়তান হাতেম নয়; শয়তান তার বাপ। তিনিই পাপিষ্ঠ। তিনি নিজেই নিজের মাথায় লাথি মেরেছেন। নিজ অপমানের সাথে নিজেই

কোলাকুলি করেছেন। একশ' কোঁড়া খাওয়ার উপযুক্ত ছেলে নয়, বরং উপযুক্ত তার সেই পিতা, যিনি ছেলের বিবাহ না দিয়ে তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছেন। গণ-ধোলাই দিতে হলে মতোয়াল্লীকেই দেওয়া উচিত।

উপস্থিত যারা ছিল, সবাই বলে উঠল ঠিকই তো। কিন্তু বদরুর পিতা কোন মন্তব্য করল না। সে যেন কাহিনী শুনতে শুনতে অন্য কোন কল্পনায় ভেসে গিয়েছিল। সমাজ ও পরিবেশের পরিস্থিতি এবং নৈতিক অবক্ষয়ের কথা চিন্তা করে সে শঙ্কিত হয়ে উঠছিল। মনে মনে বলল, 'হে আল্লাহ! ইজ্জত রক্ষা করো।'

গরীব মেয়েদের বিপদ যে অতি নিকটে প্রতি পদক্ষেপে তা বুঝেই কখনো নিজের অচল অবস্থার প্রতি ধিক্কার কখনো বা সমাজের মানুষের প্রতি শত ঘৃণা, শত তিরস্কার ক'রে মনটা যেন পৃথিবীতেই ছিল না। স্বার্থপর এই দুনিয়ায় তাদের মত অসহায় গরীবদের থাকার চেয়ে না থাকাই যে ভালো।

ধনবান যারা, বস্তুতঃ তাদের বেশীর ভাগই নিরানব্বই হলে একশ' কি ক'রে হবে সেই চিন্তায় থাকে। ধন-প্রতিযোগিতার এই বিশাল ময়দানে কে আর হালাল-হারাম দেখে? কে আর দেখে গরীবদের দুরবস্থা?

কিন্তু যারা হালাল-হারামের জ্ঞান রাখে, যারা ভুক্তভোগী গরীব তাদের তো গরীবদের প্রতি সহানুভূতি থাকা উচিত। কিন্তু নাঃ। তারাও চাচ্ছে যে, যদি কোন প্রকারে ওদের মত বড়লোক হওয়া যায়। আর সেই জন্য বড়লোক হওয়ার মত কোন পুঁজি বা ব্যবসা না পেলে বরের বাবা সেজে কনের বাবার ঘাড় ভেঙে সাঁজে বড়লোক হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে। রাত্রির বেলায় ছেঁড়া কাঁথায় ঘুম দিয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে!

যাদের পুত্র-কন্যা দুই আছে, তারাও তো সকল প্রকার সুখ-দুঃখ জেনেই থাকে। আর সেই জন্য তাদের অনেকে নিজের দুঃখকে সুখে পরিণত করতে পরের ঘাড়ে দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দেয়। তারা বলে মেয়ের বিয়েতে যখন দিতেই হয়েছে, তখন ছেলের বিয়েতে নেব না কেন? এরা বলতে চায়, আমার ঘর যখন চুরি হয়েছে, তখন আমি চুরি করব না কেন? অমুক শেখ যখন আমার ঘর ডাকাতি করেছে, তখন অমুক মল্লিকের ঘর ডাকাতি করতে আমার বাধা কোথায়? 'তুমি অধম হইলে আমি উত্তম হইব কেন?'

মুশকিল হল যাদের মোটেই ছেলে নেই। তারা তো প্রতিশোধের বোঝা কোন বাহানাতে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারে না। বরং তাদেরকে জমি-ভিটে বিক্রি করেও কন্যা-বিদায় করতে হয়। ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিযোগিতায় পুত্রহীনরাই পরাজিত হয়ে থাকে।

কি করবে এমন কনের পিতারা, যাদের নিকট বরের জন্য কোন স্বার্থ অথবা কিছু দেওয়ার মত কোন সামর্থ্য নেই? বদরুর পিতা কি করবে? কিভাবে এত বড় পর্বতসম

বোঝাকে নিজের মাথা থেকে নামিয়ে অবসর নেবে তুচ্ছ এই মায়ার সংসার থেকে? যত দিন যায়, বদরুর পিতা-পিতামহের দুশ্চিন্তা তাদের হৃদয়কে তত ব্যাকুল করে তোলে।

সন্ধ্যার সময় পিতা বাড়ি ফিরে এল। গিয়েছিল এক গ্রামে। সেখানে এক ছেলে এইমাত্র ‘ফাজিল’ পাশ করে ঘরে ফিরেছেন। বড় আশা ছিল যে, ‘মওলানা’ সাহেব হয়তো বিনা পণে বিবাহ করবেন, যেহেতু বদরুও উর্দু-আরবী লেখাপড়া জানে এবং দ্বীনদারও। কিন্তু সেখানে গিয়েও কোন সুফল হয়নি। রূপে-গুণে সবেই ঠিক আছে, কেবল ছেলেকে সাইকেল-ঘড়ি চাই, মেয়েকে দিতে হবে এক ভরি সোনা, আর সেই সাথে লগনও। যদি দিতে না পারে, তাহলে মাটি দিলেও চলবে। মাটি নিতে তো কোন অসুবিধা নেই!

হায়রে! যে সরিষায় ভূত ছাড়বে, সেই সরিষাতেই ভূত আসন গেড়ে বসে আছে! আঘাতের অভিযোগ মানুষ যার কাছে নিয়ে যাবে, সেই যদি আঘাতদাতা হয়, তাহলে মানুষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? বেড়া ক্ষেত খেলে ক্ষেতের ফসলের অবস্থা আর কি হবে? ‘রক্ষক যদি ভক্ষক হয় কে করিবে রক্ষা, ধার্মিক যদি চুরি করে, কে দেবে তারে শিক্ষা?’

মানুষের অন্তরের আবর্জনাদি দূরীভূত করতে, তাদের ভূতাসন কলেবর হতে ভূত বিতাড়িত করতে, তাদের কুসংস্কারময় হৃদয়ে সংস্কার আনতে যে পানি ব্যবহার হয়, সেই পানিতেই যদি আবর্জনা ও ভূত বসে থাকে, তবে তা ব্যবহার করলে যে মানুষের অন্তরাসনে দ্বিগুণ আবর্জনা, ভূত ও কুসংস্কার জমাট বাঁধবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে যালেম সমাজের আলেমও যালেম, সে সমাজ কি আর যুলুম থেকে বাঁচতে পারে?

কিন্তু কেন? যাঁদেরকে নবীর নায়েব ও পথপ্রদর্শক হিসাবে নির্বাচিত ও নিযুক্ত করা হয়, তাঁরাই যদি অন্ধ হন, তাহলে তিনি নিজেকে গর্তে ফেলে নিজের প্রাণ ওষ্ঠাগত তো করবেনই, সেই সাথে যারা তাঁর পথপ্রদর্শনের অনুসরণ করবে, তারাও পটল তুলবে না কি?

এ প্রস্তাবের কথা শুনে অনেকেই মন্তব্য করল, আলেম নয় সে, যালেম। কেউ বলল, কেন? ধর্ম শুধু আলেমরাই মানবে নাকি? কেউ বলল, সাধারণ মানুষ পাপ করলে, পাপী। কিন্তু আলেম পাপ করলে, সে জ্ঞানপাপী।

গ্রামের ইমাম সাহেব বললেন, আমার মনে হয়, যেখানে মওলানা লেখাপড়া করেছেন, সেখানকার ওস্তাদরা হয়তো ঠিকমত পড়াননি। নচেৎ ‘কিতাবুন্নিকাহ’ পড়ার সময় তাঁর মাথা ধরার অসুখ করেছিল। নচেৎ এতকিছু জানাশোনার পর কুরআন-হাদীসের এত বড় অবমাননা ও বিরোধিতা কি ক’রে করতে পারেন?

◆

(১৪)

সলীমুদ্দীন পিতাসহ একেবারে যেন হাল ছেড়ে বসে গেল। মনের মাঝে যেটুকু আশার প্রদীপ দিপ্‌দিপ্ করে জ্বলছিল, তাও সেদিন মৌলবী সাহেবের জবাবে যেন পূর্ণভাবেই নিভে গেছে। কিন্তু উপায়?

একটি শেষ উপায় আছে, আর তা হল, যদি বাকী জমি ও ভিটেটুকু বিক্রি করে। কিন্তু তাতে যে সমাধা হবে, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? বিয়ের খরচ আছে। বরযাত্রীদের মান রক্ষা করতে হবে। তারপর জামাই বাবুর সাজ-পোশাক আছে। এসবগুলো আসবে কোথা থেকে?

বড় আশা ছিল বাঘরায়ে। কিন্তু সেখানেও বাঘের মত ভীষণ রায় শুনে ছাগের মত ফিরে আসতে হয়েছে। এখন মেয়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে। তাকে আর ঘরে রাখা চলে না। ফিতনার যুগে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, তত তাড়াতাড়ি মেয়ে পাত্রস্থ করা উচিত। গ্রামের লোকেরাও সাত-সতেরো কথা বলতে শুরু করেছে। অকস্মাৎ কোন কলঙ্ক রটাও অস্বাভাবিক নয় পাড়া-গ্রামে। যেহেতু যাদের কোন কাজ-ধান্দা নেই, তাদের কাজই হল পরচর্চা করা।

পিতা-পুত্রে সিদ্ধান্ত নিল যে, তাদের ভবিষ্যতে যা হবার হবে, কিন্তু জমি ও ভিটেটুকু বিক্রি করে বদরুর বিয়ে দিতে হবে এবং গড়পড়তায় ঐ আলেমই জামাই হিসাবে ভালো হবে।

আব্বা বাহিরে গেলে বদরু হাসতে হাসতে দাদুর কাছে বসে তার পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, ‘বল না, আমার বিয়ে ঠিক হল?’

এ কথা বদরু কেন জিজ্ঞাসা করছে, তা হয়তো দাদু অনুমান করে ফেলেছে। আব্বার দশা দেখে ও তার মনের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে তার মন যে কত দগ্ধ হচ্ছে, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? দাদু ক্লেশের হাসি হেসে বলল, ‘কেন? তোমার দুশ্চিন্তা কিসের?’

- এমনি জানতে চাই। আমার বিয়ে অথচ আমি কি জানতে পারি না।

- অবশ্যই। জানতেও পারবে এবং তোমার মতামতও লাগবে।

- কোথায় ঠিক হল?

- বাঘরায়ে। খুব বন্যা দেখতে পাবে। নদীর ধার তো!

বদরু সে কথায় কান না করে দাঁতে আঙ্গুল রেখে বলল, ‘কত কি লাগবে?’

দাদু বলল, ‘সে তোমাকে শুনতে হবে না।’ কারণ সে বদরুর স্বভাব জানত। শুনেই

তার মন খারাপ করবে এবং বিয়ে করব না বলবে। কিন্তু বদরু ছাড়বার পাত্রী নয়। জোর দিয়ে বলল, 'বল না। কি কি নেবে বলেছে?'

দাদু ম্লান হাসি হেসে বলল, 'তোমার শুনে কাজ কি?'

- কাজ থাক্ আর না-ই থাক্। তোমাকে বলতেই হবে।
- তুমি বড় পাগলী মেয়ে? কিছু লাগবে না।
- আমি জানি, কিছু না নিয়ে কেউ বিয়ে করবে না। সত্যি করে বল, কি কি লাগবে?
- এক ভরি সোনা, সাইকেল, ঘড়ি---।

কথাটি বলে বৃদ্ধ পৌত্রীর মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বদরু ক্ষণেকের জন্য বাইরের দিকে দৃষ্টি ফিরাল। সাথে সাথে যেন তার মনের গতি পাল্টে গেল। দুঃখ-সন্তপ্ত মন হতে রুদ্ধ কণ্ঠে কি যেন প্রকাশ পেতে চাইল। কিছুকাল নীরব থেকে গলা ঝেড়ে বলল, 'কিন্তু অত টাকা কোথায় পাবে?'

দাদু বলল, 'সেটা আমরা ভাবব। জমিটা বিক্রি করব। তাতে না হলে বাড়িটাও বিক্রি করে দেব।'

এটাই শুনতে বদরু ভয় করছিল। এক্ষণে তার ভিতর কাঁপতে শুরু করল। তার সুখের জন্য এত বড় কুরবানী? ভিটা-বাড়িও বিক্রি করতে হবে? বাপ-দাদার দুঃখের বিনিময়ে মেয়ের সুখ রচিত হবে? কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আর তোমরা কি করবে? কোথায় বাস করবে, কি খাবে?'

পিতামহ আর উত্তর দিল না। মনে হয় উত্তর দেওয়ার মত কোন কথা তার আর ছিল না। চক্ষুর কোণে অনায়াসে নিঃসৃত একবিন্দু অশ্রুই বদরুকে তার উত্তর জানিয়ে দিল।

বদরু ক্ষণকাল উত্তরে অপেক্ষায় থেকে অশ্রুছলছল নেত্রে পিতামহের প্রতি মায়াময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'দেখ, তোমাদের হাতে ধরে বলছি। আমাকে নিয়ে তোমরা এমন যুলুম করো না। আমি বিয়ে করবই না। আমার বিয়ের থেকে মরণই ভালো---।'

পিতামহ বদরুর এমন হৃদয়-বিদারক মন্তব্য শুনে নিজের চাপা কান্না আর চেপে রাখতে পারল না। তার চক্ষুনদী হতে অশ্রুজল জোয়ারের মত উপচে উঠল। তারপর কষ্টের সাথে তা দমন করে পৌত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ছিঃ! ও কথা বলতে হয় না মা! ও কথা মুখ দিয়ে বের করতে নেই। ওতে আল্লাহ নারাজ হন।'

বদরুন্নিসা বলল, 'না, এ আমার জন্য ভালো। এ আমার বিয়ে নয়, মরণ। মানুষ যখন প্রাণপ্রিয় আত্মীয়কে মরতে দেখে কিংবা অসহায়ভাবে হারিয়ে ফেলে তখনই দুঃখ ক'রে কান্না কাঁদে। কিন্তু যাদের বিয়ে হয় এবং যারা বিয়ে দেয় তারা কত খুশী করে। কত আনন্দের ঝড় বয়ে আনে ঘরে। আচ্ছা তুমি বল তো, কোনদিন আমার বিয়ের জন্য একদন্ড আনন্দ প্রকাশ করেছ? আব্বা কোনদিন খুশী হয়েছে? আমি কোনদিন আনন্দ অনুভব করেছি? যদি তাই না হয়, যদি আমার মরণেও কাঁদতে হয়, আমার বিয়েতেও কাঁদতে হয়, তাহলে শুধু খরচ করে লাভ কি? তোমাদেরকে পথের ভিখারীরূপে দেখার চাইতে আমার মরণ শতগুণে শ্রেয় নয় কি? শুধু খাটে করে দিয়ে আসবে কায়েমী ঘরে, যেখানে চিরসুখে বাস করব।'

পিতামহ কত দুঃখ পেয়েছিল জানি না। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য আবারও প্রবোধ দান করে বলল, 'ছিঃ! ও কথা মুখে আনিস্ না। আমাদের আল্লাহ আছেন। ভাগ্য ছাড়া কি পথ আছে? ভাগ্যের সাথে কি লড়তে পারবি? শত কষ্টেও মরণ চাইতে নেই। বিপদে ধৈর্য ধরতে হয়। অধৈর্য হলে আল্লাহর তকদীরে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়, আর তাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।'

বদরু আর কোন উত্তর করল না।

পিতামহ বদরুর মরণের কথা শুনে থেকে থেকে আতঙ্কে শিউরে উঠছিল। রাত্রি তখন গভীর। হঠাৎ সদর দরজা খোলার শব্দ শুনে বৃদ্ধ চমকে উঠল। মাথা তুলে দেখল, কিন্তু কিছু পরিদৃষ্ট হল না। সন্দেহের ঘন অন্ধকার তার হৃদয়কে আবিষ্ট করে তুলল। ধীরে ধীরে উঠে সর্বাগ্রে বদরুর কামরায় দেখল, বদরুর বিছানা খাঁখাঁ করছে। নিমেষে মনের মাঝে কে যেন কেঁদে উঠল। বিপদের আশঙ্কায় শরীর যেন কেঁপে উঠে শ্রান্তি এনে সেখানেই বসে যেতে বাধ্য করল। পুনঃ ধীরে ধীরে দরজার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হল। অশুভ চিন্তা করে মনে কে যেন জিজ্ঞাসা করল, বদরু আত্মহত্যার জন্য বের হয়ে যায়নি তো? পূর্বের খবর পিতা কিছুই জানে না। বৃদ্ধ তাকে জাগাবার চেষ্টাও করল না। 'আল্লাহ মান রক্ষা কর' বলতে বলতে বাহিরে বের হয়ে এল। তারপর যা দেখল তাতে মনটা আশ্বস্ত হল। দেখল বদরু পুকুরের ঘাটে ওযূ করছে। অতঃপর তাকে কিছু জানতে না দিয়ে ফিরে গিয়ে নিজ বিছানায় শয়ন করল।

বদরু পরম ভক্তি ও বিনয়ের সাথে নামায পড়তে শুরু করল। পরিশেষে কায়মনোবাক্যে মহান দয়ার সাগরের নিকট প্রার্থনা করতে লাগল। 'হে বিশ্ব-প্রতিপালক! হে রুযীর মালিক! যাবতীয় প্রশংসা তোমারই হে পরওয়ারদেগারে আলম! বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি তুমিই একমাত্র দয়ালু। তোমার অসীম করুণা হে রহমান!

যারা দিবানিশি তোমার উপাসনা-আরাধনায় মগ্ন তাদেরকে তুমি অন্নদান করে থাক, আর তাদেরকেও তুমি আহার দান করে থাক, যারা তোমার শত্রু, তোমার অবাধ্য ও দ্বীন-বিরোধী। আমি যা বিশ্বাস করি সেই মহাপ্রলয়, মহাবিচার দিবসের তুমিই মালিক, তুমিই তার সংঘটনকারী। আমি তোমারই উপাসক, আমি তোমারই নিকট সাহায্য চাই। তুমি আমাকে সরল পথ প্রদর্শন কর। যে পথে তোমার অনুগামীগণ, কুশলের সাথে করেছে

গমন, সে পথ মোরে কর প্রদর্শন। তুমিই আমার একক স্মরণ। হে মহান! তোমারই হাতে আমার জীবন-মরণ।

আর প্রভু গো! যে পথে তোমার দ্বীনের অনুসারী হতে পারব না, যে পথে গেলে তোমার অবাধ্যতা হবে, যে পথ ভ্রান্ত ও অভিশপ্ত, সে পথে আমাকে পরিচালিত করে অনুতপ্ত করো না হে প্রভু! হে আকুল হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা শ্রবণকারী! তুমি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে নাও।

মওলা গো! তুমি আমাদের অবস্থা জানো। তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করি না মওলা! হে অন্তরের গোপন রহস্য-জ্ঞাতা! তুমি আমার আশা-কামনা সবই জানো। তুমি আমাদেরকে ইহ-পরকালে সুখ-শান্তি দান কর প্রভু!

জানি না প্রভু আমার কিসে সুখ-শান্তি আছে! হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অপরিসীম জ্ঞানের অসীলায় মঙ্গল প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের অসীলায় শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না। তুমি জান, আমি জানি না এবং তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই বিবাহ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জান, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বর্কত দান কর। আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জান, তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক মঙ্গল আমার জন্য বাস্তবায়িত কর, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও।

হে আমার দয়াল আল্লাহ! কিন্তু যে বিবাহে আমার পিতা-পিতামহকে পথে বসতে হবে, তাতে আর সুখ কোথায়? আমি মনে করি আমার জন্য মরণই শ্রেয়। মরণ শ্রেয় হলে আমাকে এ দুনিয়া হতে তুলে নাও প্রভু! মরণেই আমার শান্তি। মরণই আমার উপযুক্ত পথ। মরণই আমার শ্রেষ্ঠ স্বামী। প্রভু আমার মৃত্যু ঘটিয়ে দাও।

মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়ে আমি আমার বাপ-দাদাকে বড় বিপদে ফেলেছি প্রভু! আমাকে তুলে নিয়ে তাদেরকে বিপদমুক্ত কর। আত্মহত্যা হারাম করেছ, কিন্তু তুমি দুআ কবুল করার ওয়াদা দিয়েছ। অতএব আমার দুআ কবুল কর মওলা গো!

হে আল্লাহ! এ কষ্টের জগৎ থেকে আমাকে তুলে নাও। আমার মরণ দাও। আমি আর বাঁচতে চাই না।’

পিতামহ তাঁর গুন্‌গুন্ আওয়াজ শুনে অস্থির মনে আবার বিছানা ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল বদরুর রুমের সামনে। দরজার আড়াল থেকে বদরুর আকুল প্রার্থনা শ্রবণ করছিল। মানসিক অশান্তির দাবানলে তার মনও বড় দগ্ধীভূত ছিল। অবশেষে বদরুর এমন অন্তর্জ্বালাময় দুআ শুনে আর ধৈর্য রাখতে পারল না। দরজায় করাঘাত করে চিৎকার করে বলে উঠল, ‘বদরু! এ সব কি বলছিস্ তুই! দরজা খোল্।

বদরু এক মনে নির্জনে গভীর রাতের নিঃঝুম পরিবেশে পরম ভক্তি ও আবেগের সাথে দুআ ক’রে কেঁদেই যাচ্ছিল। সে আকুল মুনাজাতে এমন বিভোর ছিল যে, পিতামহের আহবান যেন তার কানেই পৌঁছল না। সেই শব্দে পিতা সলীমুদ্দীন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় ছুটে এল। ‘কি হল, কি হল’ বলতে বলতে দরজায় আঘাত করল।

দুইজনের চিৎকারে ও দরজা ধাক্কার শব্দে পাশ্ববর্তী প্রতিবেশীর বাড়িতে যারা চৈতন্যপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা সকলেই ‘কি হয়েছে, কি ব্যাপার’ বলতে বলতে ছুটে এল। নিদ্রাঘোরে চক্ষুমর্দন করতে করতে তারা বুঝতে পারল যে, বদরু আত্মঘাতিনী হতে যাচ্ছিল।

বদরু বড় বিপদে পড়ে নামাযের পাটি তুলে দরজা খুলল। অপ্রতিভ হয়ে বিস্ময়াবিষ্ট লোচনে পিতা-পিতামহের শোকাহত মুখমন্ডলের দিকে ভ্যাল্‌ভ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

ব্যাপারটা যে তারই ছেলেমানুষির কারণে সংঘটিত হয়েছে, তা না বুঝে আঙিনায় উপস্থিত প্রতিবেশিনী মেয়েদের প্রতি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

পিতা বলল, ‘বদরু! কি করছিস বল তো?’

বদরু মুখ খুলল না। শুধু আঁচল দিয়ে চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রুর রেখা গাল থেকে মুছে নিল।

পিতা-পিতামহ সহ প্রতিবেশিনীরা বহু কথাই বুঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু শোকাতুরা বদরু সে সব কথার কোন উত্তরই করল না।

পরিশেষে পিতা সকলকে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানালে সকলেই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে গেল। বদরুকে বুঝিয়ে শয়ন করতে আদেশ করলে বিনা বাক্যব্যয়ে সে শয়ন করল।

কিন্তু পিতা-পিতামহকে নিদ্রা আর স্পর্শ করল না। নিজ নিজ বিছানা হতে চারটি চক্ষু বদরুর রুমের দরজায় ফেলে রেখে প্রভাত করল।

জানি না বদরুন্নিসার কি হচ্ছিল? লজ্জা ও অপমানে যেন সে মরে যাচ্ছিল। সে রাতে তারও আর ঘুম এল না। কোন রকমে সেই দগ্ধময়ী বিভাবরীর অবসান ঘটল।

সকালে মেয়েদের আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল এ ঘরে সে ঘরে, এ ঘাটে সে ঘাটে। সকাল বেলায় সকলের জন্য গরম চায়ের সাথে তাজা বিস্কুট হল গতরাত্রের বদরুর কান্ড। এক কান দুই কান হতে হতে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল সে খবর। গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হল। একভাগ নিল মৌমাছির ভূমিকা, একভাগ নিল গুয়ে-মাছির

- এ কাজে তাকে তুমি চাও?

- চাই না কেন? এ কাজটা তো আর আমার একা নয়। এ কাজ সমগ্র মুসলিম সমাজের; যা হবে আল্লাহর ওয়াস্তে। এতে তো সকলেরই অধিকার আছে। তাঁর নিকটে বন্ধু-শত্রু সবাই সমান।

- তা হলেও, যে তোমার মত বন্ধুর চরম শত্রুতা করেছে, সে তো ইসলামেরও শত্রুতা করতে পারে।

- করুক। সে তো ব্যক্তিগত শত্রুতা। এখন বড় কথা এই যে, শত্রুকে বন্ধু করা। বন্ধু তো বন্ধুই আছে। যে তোমার সাথে শত্রুতা করতে চায়, ঘৃণা বেসে তার বক্ষ-বিদারণ না করে আশ্লেষে ধারণ করাই আসল কাজ। এটিও ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির একটি বৈশিষ্ট্য। আমি জানি আমার শত্রু আছে, প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, হিংসুক আছে। এটা স্বাভাবিক। এ হল আমার সাফল্যের প্রমাণ। আমি তাদের সকলকে উদার মনে উপেক্ষা করে চলি। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দিন।

একটা কথা জেনে রাখা উচিত, প্রকাশ্য শত্রু হতে গুপ্ত বা বন্ধু-শত্রু যেরূপ চতুর্গুণ ভয়ানক, ঠিক তদ্রূপই শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করতে পারলে তদোর্ধ্বগুণ উত্তম। অতএব বন্ধু-শত্রু সকল কাজের লোককেই আমি পত্র দ্বারা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আশা করি তাদের অনেকেই আসবে।

- কিন্তু কাজের পরিকাঠামো কেমন হয়েছে?

- ভালোই হয়েছে। গ্রামের প্রতি পাড়ায় চারটি করে যুবক এবং চার পাড়ায় দু'টি করে আটটি প্রৌঢ় সর্বমোট চব্বিশজন মেম্বর ঠিক করা হয়েছে। তাদের কাজ হল, তারা প্রথমতঃ নিজেকে দ্বীনী ছাঁচে গড়ে তুলবে, পরপর নিজ পরিবারকে দ্বীন বিষয়ে সচেতন করবে। নিজ বাড়ি বা পাড়ায় কোন নোংরা কাজ দেখলে তা দূর করার চেষ্টা করবে, সদুপদেশ দ্বারা প্রতিবাদ করবে। একটি ফান্ড্ করা হয়েছে, গরীব মানুষদেরকে সেখান থেকে সাহায্য করা হবে। একটি ইসলামী লাইব্রেরীও খোলা হয়েছে। আর এইভাবে প্রত্যেক গ্রামে যৌথ উদ্যোগ প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মাঝে দ্বীনী চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে।

- কিন্তু এ কাজ চলবে বলে মনে হয় না। অধিকাংশ মানুষই এর বিরোধিতা করবে। কারণ তাদের স্বার্থে বড় রকমের আঘাত লাগবে। তাদের বিলাস-জীবনে বড় ব্যাঘাত ঘটবে।

- আমরাই যদি নিরাশাবাদী হই, কাজে নামার আগেই পিছপা হই, তাহলে তো আর কিছুই হবে না।

- না, আমি সমস্যার কথা বলছি আর কি। আমরা যদিও আশাবাদী ও উদ্যমী হই, তবুও

প্রকৃতি। আর অন্য একভাগ দু-দলের মাদল।

নিলোফার বলল, 'আহা! বড় গরীব। তাই হয়তো দুঃখ করে মরতে চেয়েছে।'

প্রতিবাদে নেতুর মা বলল, 'তোরা ছাই জানিস্। ছোট থেকে ভালবাসা করে বসে আছে। আর বাবার এখন শীতের ঘুম! ধাড়ি মেয়েটার বিয়ে দেয়ার নাম নাই। দেখবি কেন, কোনদিন কিছু ঘটিয়ে বসবে। আমাদের সদু বলছে, যদি ওর বাপ না জাগত, তাহলে আজই ছুঁড়ি মরে বসে থাকত! আমি একদিন নিজের চোখে দেখেছি, ও পাড়ার ফটিক ওদের ঘর ঢুকছে।'

বলা শেষ হলে খাঁদী বলে উঠল, 'হ্যাঁ বোন! আমিও দেখেছি, কোথাকার কলেজে পড়া একটি মস্তান ছেলে ওদের ঘর ঢুকে ওর সাথে কথা বলছিল।

আবার মুখ নিয়ে নিলোফার বলল, 'কেউ ঘরে ঢুকলেই কি কেউ খারাপ হয়ে যায়? ঘরে তো তার বাপ-দাদু রয়েছে। সন্দেহ করতে হয় না। সন্দেহে ঈমান যায় বোন!'

মোটের উপর কথা, বদরুর চরিত্রে আজ হতে তার নিজের দোষে অথবা বাপ-দাদুর অদূরদর্শিতামূলক আচরণে ক্ষত সৃষ্টি হল। আর সেই ক্ষতের উপর গুয়ে মাছির দল ডিম পাড়ার বড় সুন্দর জায়গা পেয়ে গেল। ভন্ভনে মাছির ভন্ভনানিতে তা প্রচার হতে লাগল। আর গরীবের দোষ হয় পাহাড় সমান। মায়ের পোড়ে না মাসীর পোড়ে, পাড়া-পড়শীর ধবলা ওড়ে। যার গরু সে বলে বাঁজা, পাড়া-পড়শী বলে সাত-বিয়েন! কে কার মুখে হাত দেবে?

বদরুদের বড় দোষ তারা খুব গরীব। নিচু আল দিয়েই পানি গড়িয়ে যায়। নরম জায়গায় বিড়ালের আঁচড় সুবিধা হয়। গরীব মড়ার উপর খাড়ার ঘা! একেই ভাগ্য মন্দ, তার উপরে কলঙ্কের ছাপ! অদৃষ্ট করলা ভাতে, বীচি কচ্কচ্ করে তাতে, পড়ল বীচি বুড়ার পাতে।

নানা রকম সজ্জিত অপবাদ বদরুর লাবণ্যময় দেহে ঠিক তার বিবাহের পূর্বলগ্নে তেল-হলদি মাখিয়ে দেওয়ার মত লোকে মাখিয়ে দিল। খবর পৌঁছে গেল বাঘরায়ে। ফলে কুঁড়ি অবস্থাতেই তার বিয়ের ফুল ডাল থেকে খসে পড়ল। অপমান ও ক্ষোভে বদরুর হৃদয় বিষময় হয়ে উঠল। আর সেই সাথে পুনর্জাগরিত বিয়ের আশাটুকুকে মন থেকে মুছে দিল। শুধু মহান করুণাময়ের করুণার আশাধারিণী হয়ে চাতকের মত দুআ কবুলের অপেক্ষায় রইল। মরণের সাধ তার মনে আরো তীব্র হয়ে উঠল।

(১৫)

- আস্সালামু আলাইকুম!

- অআলাইকুমুস্ সালাম! কে ভাই? হাসান? এসো। ভালো আছ?

- আল-হামদু লিল্লাহ! তুমি কেমন আছ? আশা করি ভালো।

- হ্যাঁ, মা শাআল্লাহ ভালোই আছি। আচ্ছা নাযীর কেমন আছে বলতে পার? তারও তো আসার কথা ছিল; কিন্তু এল না কেন?

বিদিত যে, অধিকাংশ মানুষ স্বার্থপর। যেহেতু যাদের মালধন আছে তাদেরকে যখন যাকাৎ দিতে বলবে, তখনই হবে তাদের মাথায় কুঠারাঘাত। দিলেও মন থেকে হিসাবমত দেবে না; বরং জরিমানা আদায়ের মত লজ্জার সাথে আদায় করবে। প্রায় সকলেরই বাড়িতে ছোট-বড় দুটো-পাঁচটা ছেলেমেয়ে আছে। অতএব যখন তাদেরকে বলতে যাবে, 'বিয়েতে বরপণ নেওয়া হারাম', তখন তারা বলবে, 'তোদের কথায় হাজার সালাম। মৌলবীরা নিচ্ছে তো আমরা নেব না কেন?' প্রেমিক-প্রেমিকার অবাধ মেলামেশা যখন বন্ধ করতে যাবে, তখন হয়তো প্রেমিকের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চক্ষু দেখে ভয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে হবে। সূদ খাওয়া যখন বন্ধ করতে যাবে, তখন সূদখোরও তোমার গুটি মারা জন্য বসে থাকবে। মহিলাদেরকে শরয়ী পর্দা করতে বললে মহিলারাই হয়তো নাক সিঁটকাবে। এইভাবে সমাজের প্রায় সকল মানুষই আমাদের দুশমন হয়ে যাবে। গোঁড়াপন্থী, প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল, সেকেলে, প্রগতিবিরোধী, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে গালি দেবে। মুনাফিকরা সেই সুযোগে আমাদের বদনাম করতে প্রচার-মাধ্যম ব্যবহার করবে। আর তাতে খোশ হবে কাফেররা।

জামাল ক্ষণেক চিন্তা করে বলল, 'দেখ, হাজার হলেও আমাদের পিছপা হওয়া উচিত নয়। কেননা, আমরা যদি ছাগলের মত ঝিম্‌ঝিম্‌ বৃষ্টি দেখে ঘর ঢুকি, তাহলে দ্বীন প্রতিষ্ঠা হবে কিভাবে। আর বদনামের কথা বলছ? যেই কোন ভালো কাজ করবে, সেই খারাপ লোক দ্বারা বদনাম হবে। এটাই দুনিয়ার নীতি। নবীদের বদনাম হয়েছে। তাহলে আমরা কি বাঁচতে পারব? সুতরাং 'ঢেউ দেখে লা ডুবিয়ে দেওয়া' জ্ঞানীর কাজ নয়। কাঁটা দেখে গোলাপ তোলা থেকে বিরত হওয়া কাপুরুষের কাজ। আর এ কথা সত্য যে, মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে সাহায্য করেন। তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

দুই মাস পর একটি জলসা অনুষ্ঠিত হল। ইসলামের বিধি-বিধানকে সকলে না মানলেও ইসলাম নিয়ে মুসলিমরা গর্বিত। গ্রামের মেম্বর সহ ছোট-বড় প্রায় সকলে এবং বহির্গ্রাম থেকেও অনেকে উপস্থিত হয়েছিল। গ্রামের একজনকে সভাপতি নির্বাচন করে কুরআন তেলাঅতের মাধ্যম দিয়ে জলসার কাজ আরম্ভ হল। সর্বপ্রথমে জামাল উঠে দু-চার কথার ভূমিকায় নিজ মুখ্য উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলল।

---- প্রাণের ভায়েরা! আজ আমরা যে জলসায় যোগদান করেছি, তার উদ্দেশ্য আপনাদের অজানা নেই। আমরা মুসলমান। আমরা শির্ক ও বিদআতমুক্ত মুসলমান। আশা করি আমাদের সকলের মধ্যে ঈমান আছে। আমরা আসলে জমিতে বীজ বপন করে অন্ধের মত বসে আছি। বীজ ছড়ানোর সময় আমরা এ খেয়াল করিনি যে, আমরা কিসের বীজ বপন করছি। যদিও বা কেউ খেয়াল করেছি, কিন্তু জমির মাথা দিয়ে একদিনও যাইনি। কিংবা যথাসময়ে সেচ-কোঁড় করিনি। কিংবা ক্ষেতের চারিপাশে

বেড়া দিইনি। এরপর এক সময় যদি কাস্তে নিয়ে ফসল কাটতে যাই, তাহলে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, ফসল পাব কি? তখন জমির মাথায় গিয়ে দেখবেন, কারো জমি কাঁটাগাছ, কারো জমি ঘাস এবং কারো ক্ষেত আগাছা দ্বারা পরিপূর্ণ। এই অবস্থায় আমাদের আফশোস করে কোন ফল হবে কি?

- না, অবশ্যই না।

- আমরা মুসলমান; আমরা মুষলমান নই। আমরা আত্মসমর্পণকারী; আমরা অবাধ্য ও উদ্ধত নই। আমরা যদি ঈমানের জমিতে ইসলামের বীজ বপন না করি; আমরা যদি নামে 'মুসলিম' হয়ে ইসলামের কাজ না করি, আমরা যদি ঈমানী ক্ষেতকে ইসলামী সেচ না দিই, বেড়া না দিই, দেখাশোনা না করি, তাহলে কি তার মধ্যে কুসংস্কারের কাঁটাগাছ ও আগাছা জন্মাবে না? অবশ্যই জন্মাবে। মরণের পর কবরে গিয়ে তথা কিয়ামতে দেখতে পাব কি আমাদের নেকীর ফসল? নিশ্চয়ই না।

আমরা ভ্রূক্ষেপ করিনি বলে আমাদের মনের জমি জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেছে, সমাজ অশ্লীলতা ও নোংরামীর আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আজ কুসংস্কার, কুপ্রথা ও বিদআতী আলোকলতা ইসলামের গাছকে জড়ীভূত করে ফেলেছে, শির্কী ও কুফরী কচুরিপানা আজ ঈমানের পানিকে ঢেকে ফেলেছে। তবে না আমরা মুসলমান, যদি সে জঞ্জাল নির্মূল করে তুলে ফেলে আমরা ঈমান ও ইসলামের জমি ও দীঘিকে পরিষ্কার করতে পারি? আর যদি তা করতে হয়, তাহলে তার জন্য চাই আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রাম, নিরলস প্রচেষ্টা ও অবিরাম সংগ্রাম।

এস ভাই সকল! এস কিশোর-কিশোরী! এস তরুণ-তরুণী! এস প্রৌঢ়-প্রাচীন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আমরা সচেতন হয়ে, আল্লাহর বাণী বুকে লয়ে, নবীর আদর্শ মাথায় বয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি ঐ পাপাচার ও অবিচারের বন্যায়। আহা যে প্রবল প্লাবনে আমাদের পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজন হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে চলেছে। পারব না কি আমরা সেখানে ঝাঁপ দিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করতে?

প্রায় সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, 'আল্লাহু আকবার! নিশ্চয় পারব।'

ভাই সকল! আমরা আজ অন্ধ হয়ে পড়ে থাকা নারী ও পুরুষ। আমরা কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী ছেলে ও মেয়ে। আমরা অন্ধ না হলেও আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের সম্বল কম্বলখানি ছিনিয়ে নিচ্ছে ভাই। তা দেখে কি আমাদের চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত?

বন্ধুগণ! সে কেউ নয়, পর কেউ নয়। সে সেই কুড়ুলে লাগানো কাঠের বাঁটের মতই স্বজাত কাঠকে কেটে ধ্বংস করছে। সে আমাদেরই স্বজাতি। জাতভাই হয়ে ভ্রাতৃত্বের মধুবন্ধন বৃক্ষে কুঠারাঘাত করছে। পারব না কি আমরা তার প্রতিকার করতে, প্রতিবাদ

জানাতে?

আজ আমাদের স্বজাতির ধরানো আগুন আমাদের ঘরে দাউদাউ করে জ্বলছে। কত তরুণী-যুবতী সেই আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। পারব না কি সে লেলিহান অগ্নি নির্বাপিত করতে?

আজ আমরা স্বজাতির প্রলোভনে বিভ্রান্ত, স্বজাতির প্ররোচনায় বিপদগ্রস্ত, স্বজাতির অত্যাচারে অত্যাচারিত, স্বজাতির কুমন্ত্রণায় ঐক্যহারা, স্বজাতির অবহেলায় আমাদের গরীবরা খেতে পায় না, স্বজাতির শোষণে আমরা নিঃশেষিত। তবে কি আমরা রুখে দাঁড়াতে পারব না, যেখানে অন্যায় সেখানে কঠোর হয়ে, যেখানে অবিচার সেখানে কঠিন হয়ে? নিজেদের সদ্ব্যবহার, সুন্দর চরিত্র, যাকাত ও দান, শ্রম ও দুআ ব্যবহার করে আমরা কি পারি না সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে?

- নিশ্চয়, নিশ্চয়! খুব পারব।

- জাগো জাগো মুসলিম জাগো, জাগো আজ ঘুম ছাড়িয়ে, সঙ্গে তোমার সম্বলখানি কম্বলও গেল হারিয়ে। আজ তুমি জলজাহাজের শিহরণময় সফরে চলতে চলতে জাহাজডুবি হলে কাষ্ঠফলক ধরে ভাসতে ভাসতে এক সুন্দর দ্বীপে গিয়ে উঠলে। ভেবে দেখ মুসলিম! যে দ্বীপকে তুমি আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাতা মনে করেছ, তা আসলে নিরাপদ কি না? সুন্দর ফল-ফুল দেখে হিংস্র জন্তুর কথা ভুলে যেও না। আখেরাতের পথে চলতে চলতে দুনিয়ার এই সরাইখানায় বিভোল হয়ে যেও না। ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীর মায়ায় চিরস্থায়ী জীবনকে ভুলে বসো না।

যারা গরীব, যাদের প্রয়োজনমত বস্ত্র নেই, খাদ্য নেই, যাদের প্রভাতে পৃথিবীর আকাশে সূর্যোদয়ের সাথে মনের আকাশে দুশ্চিন্তা উদয় হয়, যারা একবেলাও পেটপুরে খেতে পায় না, অথবা একবেলা খেলে অপর বেলায় কি খাবে তার চিন্তায় পেটের খাবার হজম হয় না, যাদের কালাতিপাত হয় অশ্রু-বিসর্জন ও অভাবের কারণে কলহের মাধ্যমে, যারা বড়লোকদের কাছে ছোটলোক হয়ে ঋণ চাইতে গিয়ে সূদের পদাঘাতে ঘায়েল হয়ে দিনরাত করছে, যারা অভাবী অথচ মানুষের কাছে লজ্জায় হাত পাততে পারে না, তাদের কথা একবার ভেবে দেখেছ কি?

তোমার নিজের মাল নয়, আল্লাহর মাল, তোমার নিজের হক নয়, আল্লাহর প্রাপ্য হক থেকে তাদেরকে দান করে তাদের দুঃখের নিশীথ রজনীকে সুখের ঊষায় পরিবর্তন করার ক্ষমতা আমাদের নেই কি?

আল্লাহর হক হিসাব করে আদায় করলে আমরা পারি অনাথ-এতীমের মুখে হাসি ফোটাতে, দুঃখিনী বিধবার চোখের পানি মুছতে।

যাদের ঘরে মেয়ে আছে অথচ সামর্থ্য কিছু নেই, তাদের সহযোগিতা কি করতে পারি

না? যাদের এখনো বিবাহ হয়নি, সেই যুবক ভাইরা কি পারে না বিনা পণে বিবাহ করতে? আমরা সবাই কি এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করতে পারি না, ‘পণ নেব না, পণ দেব না, পণ নেওয়া বিয়ে খাব না’?

- পণ নেব না, পণ দেব না, পণ নেওয়া বিয়ে খাব না।

এস, ঝাঁপিয়ে পড়, সোচ্চার হও, সজাগ ও সচেতন হও, এস সংগ্রাম কর।

সংগ্রাম কর অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে।

সংগ্রাম কর ধনলোভী ও পণলোভীর বিরুদ্ধে।

সংগ্রাম কর সেই যালেমের বিরুদ্ধে, যে পরের সৌভাগ্য ছিনিয়ে নিয়ে তার ঘাড়ে দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিজের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে চায়।

সংগ্রাম কর সেই তস্করদের বিরুদ্ধে, যে পরের ধনমাল লুণ্ঠিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।

সংগ্রাম কর সে বর ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে, যারা নিরীহ নারীকে পণবন্দী বানিয়ে বরপণ ও যৌতুক আদায়ের জন্য বধূনির্যাতন ও হত্যা করে।

সংগ্রাম কর যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে; শক্তিতে কুলালে শক্তি দ্বারা, নচেৎ ভক্তি দ্বারা। কলম ও জিহ্বা দ্বারা।

সংগ্রাম কর নিজ আত্মা, ষড়রিপু ও শয়তানের বিরুদ্ধে।

সংগ্রাম কর সেই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে, যারা ইসলামে ছিদ্র অন্বেষণ করে মুসলিমদের বদনাম করতে চায় অথবা কিছু মুসলিমদের ভুল আচরণ দেখে ইসলামের বিধানকে ভুল প্রতিপন্ন করতে চায়।

এমন সময় একটি চিরকুট এল। তাতে লেখা আছে, ‘আপনি যে গরীব-দরদী কথা বলছেন, তা ঠিকই আছে। কিন্তু গরীব বা এতীমরাও কম নয়। তাদেরও আত্মাভিমান আছে। অনেক বিধবা পাপে বিজড়িত। অনেক গরীব যুবতী গোপন প্রেমে সতীত্ব ও ধর্ম নষ্ট করে। এদের সাথে দয়ার ব্যবহার কিরূপে সম্ভব?’

- আপনি যখন কোন অন্যায় দেখবেন, তখন কেবল অন্যায়কারীর সাথে যথোচিত ব্যবহার করবেন। একজনকে দেখে অপরকে অথবা সকলকে শাস্তি দেওয়ার নীতি প্রয়োগ করবেন না। তাদের কেউ আপনার প্রতি অসদ্ব্যবহার করলেও আপনি তার সাথে সদ্ব্যবহার করুন। তা না পারলেও আপনি তার সাথে অসদ্ব্যবহার করবেন না। এটাই মহত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। সে আপনাকে আঘাত দিয়েছে বলে তার সাথে ন্যায়পরায়ণতা করতে ভুলে যাবেন না। ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বাক্র সিদ্দীকের কন্যার চরিত্রে তাঁর একজন আশ্রিত মানুষ কলঙ্ক রটাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহান আল্লাহর ক্ষমালাভের উদ্দেশ্যে তিনি তার দান বন্ধ করলেন না। এটাই তো আদর্শ।

ইতিমধ্যে আরো একটি চিরকুট এল। ‘আপনি যে মহান উদ্দেশ্য সাধন করার

প্রচেষ্টায় আছেন, আল্লাহ তা সফল করুন। পরে জানাই যে, আমাদের গ্রামে একজন দরিদ্র শ্রেণীর দিনমজুর লোকের বাড়িতে অতি সুশ্রী ও সুশীলা অনূঢ়া যুবতী আছে। টাকা-পয়সার অভাবে তার বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারছে না। এ ব্যাপারে তাদের মর্মান্তিক অবস্থা চলছে। আমি দেখেছি অনেক ইজতিমাতেই পুণ্যবান যুবক ভায়েরা এই শ্রেণীর শুভ-বিবাহ করে থাকেন। আপনি যদি দয়া করে প্রচার করতেন, তাহলে ভালো হত। যদি কোন ধর্মপরায়ণ ভাই সেই মেয়েটিকে বিনা স্বার্থে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে রাজী হয়।---'

জামাল বলতে থাকল, 'বন্ধুগণ! আজ আমাদের জন্য চরম পরিতাপের বিষয় যে, আমরা নিজ মা-বোনেদের সম্মান রক্ষা করতে জানি না। কে আছেন বলুন, যদি আপনার সম্মুখ থেকে একজন যুবতীকে অপহরণ করা হয়, তাহলে আপনি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন? এমন লোক কি কেউ নেই যে, যদি কেউ তার চোখের সামনে পানিতে ডুবে যায়, তাহলে যথাসাধ্য তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে? আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, আছে কেউ?'

প্রায় সকলেই বলল, 'ইন শাআল্লাহ আছি!'

জামাল বলল, 'হাত তুলুন, আর বলুন ভাই! স্বার্থে, না বিনা স্বার্থে?'

আবেগের সাথে সকলেই হাত তুলে বলল, 'বিনা স্বার্থে।'

জামাল বলল, 'বেশ ভাই! তাহলে শুনুন, একজন দ্বীনদার দরিদ্র মানুষ তার অবিবাহিতা কন্যা সহ বিপদের নদী-স্রোতে পড়ে গেছে। একজন গিয়ে তার কন্যাকে বিনা স্বার্থে বিবাহ করে তার বাবাকে উদ্ধার করুন। বলুন কোন অবিবাহিত যুবক যেতে রাজী আছেন?'

এবারে সকলেই নীরব-নিস্তব্ধ। কোন কথা কারো মুখ হতে আর বের হতে চায় না। দুই নদী তো আর এক নয়। ওটা পানির নদী, আর এটা বিপদের নদী। এ নদীতে নামলে যে বড় ঠকতে হয়! এত বড় একটা কাজ আবেগে পড়ে জোশে করলে তো হয় না, এতে তো হুঁশ লাগে। তাছাড়া মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয়।

জামাল বলল, 'কি ভাই। দমে গেলেন? থেমে গেলেন? কোন ঠকা হবে না। অবশ্য দুনিয়াদারীর ক্ষতি হবে। দ্বীনদারীর স্বার্থে যদি দুনিয়াদারীর লোভ ত্যাগ করেন, তাহলে মহান আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভায়ের কাজ উদ্ধার করে দেয়, আল্লাহ তার কাজ উদ্ধার করে দেন। কোথায় সে আল্লাহ-ওয়ালা যুবক? কোথায় সে ধর্মপ্রাণ মন? কোথায় সে ভক্তিময় প্রাণ? কোথায় সে গরীব-দরদী হৃদয়?'

ইত্যবসরে একটি যুবক ইতস্ততঃ করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলল, 'আমি আছি জী!'

আলহামদু লিল্লাহ! না'রায়ে তকবীর!

আল্লাহু আকবার!

না'রায়ে তকবীর!

আল্লাহু আকবার!

সভার আশপাশ যেন তকবীর-নিনাদে কেঁপে উঠল। সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হল। সভার মাঝে একটা খুশীর গুঞ্জরন পরিবেশকে মুগ্ধ করে তুলল। সবাই যেন যুবককে লক্ষ্য করে শাবাশী দিতে লাগল।

জামাল বলল, 'ভাগ্য আপনার ভালো হবে। জানতে পেরেছি যে, কনে রূপবতী, গুণবতী ও দ্বীনদার। কেবল গরীব তাই। আপনার পরিচয় কি ভাই?

এমন সময় এক কান্ড বাধল। যুবকের পিতা কোথায় বসে ছিল। পলকে উড়ে এসে ছেলেকে বসতে ইঙ্গিত করে বলল, 'কাকে বিয়ে করবি? কে না কে, না জেনে, না শুনে, না দেখেই আবার বিয়ে হয় নাকি? চলে আয় এখান হতে। ভারী ঈমানদার হয়ে উঠেছিস দেখছি!'

জামাল বলল, 'না না, দেখে-শুনেই পছন্দ হলে করবে। এখন বিয়ে পড়াচ্ছি না। আপনি ক্ষান্ত হন।'

যুবক রাগ ও আবেগে পিতার বিদ্রোহী হয়ে বলে উঠল, 'একশ'বার করব। লোকের মত টাকা নিয়ে বিয়ে ক'রে বিবির গোলাম হতে আমি রাজী নই।

- এ বিয়ে করলে আমার ঘর ঢুকতে পারবি না।

- ঢুকব না।

ততক্ষণে জালসার উপস্থিত লোকেরা কান্ড দেখার জন্য তাদের চারিপাশে ভিড় জমাতে শুরু করল। জামালের শত অনুরোধ সত্ত্বেও নানা মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সভা ভঙ্গ হয়ে গেল।

(১৬)

বিবাহের সংবাদ পেলে বদরু যেন আকাশ থেকে পড়ল! হঠাৎ নাটকীয়ভাবে তার বিবাহ ঠিক হয়ে গেল? ছেলে নাকি ভালো, শিক্ষিত এবং স্কুলের মাষ্টারও। খবর শুনে বদরুর বুক দুরু-দুরু ক'রে কাঁপতে লাগল। কিন্তু স্বভাবতই সে মনকে প্রশ্ন করতে লাগল, এ খবর সুখের, না দুঃখের? 'উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' এভাবে হঠাৎ বিয়ে কিভাবে সম্পন্ন হতে পারে তা বদরু খুঁজেও পাচ্ছিল না।

আহা! গরীব দুঃখিনীর বিয়ে। ঘরে ধান নেই, চাল নেই। টাকা নেই, পয়সা নেই। পাঁচটা আত্মীয়-স্বজন তাও নেই। আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই, আনন্দের লেশমাত্র নেই। প্রসাধন-

সামগ্রী নেই, কোন অলঙ্কার নেই, সাজ-সজ্জার নতুন পোশাক নেই। স্নেহময়ী মা নেই, খালা নেই। ভাই নেই, বোন নেই। পিতার মুখে হাসি নেই, পিতামহের মুখে কথা নেই। গায়ে তেল-হলুদ নেই, মাথার চুলের পারিপাট্য নেই, ঘর-দুয়ারও সাজানো-গুছানো নেই। হৃদয়ে আশা নেই, সুখ নেই। বরেরও কোন আনন্দ নেই, তার মা-বাবার কারো মত নেই। ভোজ নেই, অলীমা নেই। সবই নেই, কিছুই নেই। এই 'নেই-নেই'-এর মধ্যস্থলে বদরুর বিয়ে। এই বাড়া ভাত খেয়ে গরীব-কন্যার বিয়ে। বদরু কপালে করাঘাত করে নির্জনে অশ্রুবিসর্জন করে যাচ্ছিল।

যথাসময়ে গ্রামের কিছু লোক সমবেত হয়ে কাযী সাহেব বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। সেই বিবাহ-মজলিসে বর কাঁদল, কনের পিতা-পিতামহ কাঁদল, প্রায় সকলে কেঁদে উঠল। নির্জনে কাঁদল কনেও। বরকনের উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে দুআ দিল সকলেই। সাহস দিল বরকে।

দু' রাকআত নামায পড়ে বাসর-শয্যায় বদরু স্বামীর বুকে মাথা রেখে হু-হু করে কেঁদে উঠল। স্বামী বদরুর কপালে হাত রেখে দুআ পড়ল। অতঃপর সস্নেহে চুম্বন দিয়ে বলল, 'ছিঃ! এমন করে কাঁদতে আছে?'

কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে সেও গুপ্ত কান্না চেপে রাখতে পারল না। আজ শুভ প্রথম রজনীর মধু-মিলনে প্রেম প্রকাশ হল অশ্রু বিনিময় ক'রে!

বদরু স্বামীর কান্না দেখে অবাক হয়ে গেল। ভাবল, সে হয়তো আজকের রাতে দুঃখ উথলিয়ে ঠিক করছে না। জোর করে সংবরণ করে নিয়ে বলল, 'একি! আপনিও কাঁদছেন? ছিঃ! পুরুষ মানুষের কান্না শোভা পায় না। আপনি আমার মত হতভাগীকে উদ্ধার করার জন্য কত অপমান সহ্য করেছেন। আব্বা-আম্মার সম্মতি না নিয়ে আপনি আমাকে বরণ করেছেন। আমি আপনার জীবনে সুখের জোয়ার এনে সে ঋণ পরিশোধ করব ইন শাআল্লাহ। আপনার ঠকা হবে না প্রিয়! আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।'

স্বামী বলল, 'ও কথা বলো না বদরু! যেদিন থেকে ঈমানের সাথে যৌবনে পদার্পণ করেছি, সেদিন থেকে তোমার মত একটি মেয়ের খোঁজে ছিলাম। আল্লাহ আমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আব্বা-আম্মার ইচ্ছা ছিল টাকার পুতুলকে বউ করার। কিন্তু আমি তা চাইনি। আর অপমানের কথা বলছ? তোমার মত মুক্তার জন্য যদি আমাকে রক্তও দিতে হয়, তবুও স্বীকার।'

সপ্তাহ খানেক শ্বশুর বাড়িতে থেকেই স্কুল করল মাষ্টার আব্দুন নূর। তার জীবন-যৌবনে বসন্ত এল। সুখের পরম আবেশে ও স্ত্রীর প্রেম-পরশে বড় আনন্দিত ছিল সে। কিন্তু বাড়ি তো ফিরতে হবে। শ্বশুর বাড়িতে থেকে যাওয়াটাও ভালো দেখায় না।

এক রাতে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল, তারা বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু যদি বাড়ি ঢুকতে না দিয়ে সমস্যা বাধায়? ততটা নিরাশাবাদী নয় মাষ্টার। মামার বাড়ি থেকে সে একটু আশা ও ইঙ্গিত পেয়েছিল। তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে পিতা-পিতামহের নিকট থেকে দুআ ও বিদায় নিয়ে নব-দম্পতি নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। পথ চলতে চলতে বদরুর মনে হতে লাগল, সে যেন মদ্যপান করেছে। পথের যে মাটির উপর সে পা রাখছে, সেই মাটিই যেন তাকে আছাড়ে ফেলে দিতে চাচ্ছে। একটি পা কোন রকম অগ্রসর হলে দ্বিতীয় পা-টি যেন অগ্রসর হতেই চায় না। আরবী ঘোড়া যেরূপ মালিকের বিপদ সম্মুখীন বুঝে থমকে থমকে দাঁড়িয়ে যায়, অনুরূপই করছিল বদরুর পা দু'টি।

বদরু জানতে পেরেছিল স্বামীরা খুব ধনী। চিন্তা এই যে, নিঃস্ব গরীব-কন্যা স্বামীর ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হতে পারবে কি না? এত দুঃখের পর তার এত সুখ সইবে কি না? দুর্বল মন আশার দিকটাই আঁকড়ে ধরে মনের মাঝে অঙ্কিত করল সুখের জীবন। নিজ প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে শত কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করতে লাগল। ভাবল, সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিমেষে ফকীরকে বাদশা, বাদশাকে ফকীর বানাতে পারেন। অসম্মানীকে সম্মানী, সম্মানীকে অসম্মানী করতে পারেন। একজন অবলা নারীর ভাগ্য একজন পুরুষের সংস্পর্শে এসে সৌভাগ্যে পরিণত হয়। একজন দুর্বল পুরুষের ভাগ্য একজন নারীর সংস্পর্শে এসে সৌভাগ্যে পরিণত হয়। এর বিপরীতও করে থাকেন মহান সৃষ্টিকর্তা। সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য সাজানো আছে পৃথিবীর এ সংসারে। যে যেটা লাভ করে তা একান্ত ভাগ্য ও ভাগের ব্যাপার বৈ কি? এখন তার পিতা-পিতামহ কত যে সুখী ও খুশী হবে এই ভেবে বদরু স্বামীর অলক্ষ্যে একটু কষ্টহাসি হাসল।

সুখ-রচনার পরিকল্পনা করতে করতে বদরু পথ হাঁটছিল। স্বামী চলছিল সামনে, আর পিছনে তার অনুসরণ করছিল সে। দূর বেশী নয়। হাঁটা পথ। বিবাহের পর এ গ্রাম্য এলাকায় সাধারণতঃ নতুন কনে ট্যাক্সি, পালকি, আর তাতে সামর্থ্য না থাকলে গরু-মহিষের গাড়িতে শ্বশুরবাড়ি যায়। কিন্তু তার বিয়ে তো আর সেই বিয়ে নয় যে, তার কোন আশা থাকবে। এ পথে রিক্সাও চলে না যে, স্বামী তা ভাড়া করে তাকে নিজ বাড়ি নিয়ে যাবে। আলপথে পদব্রজেই জনহীন ফসলভরা মাঠ অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছিল দুজনে। নতুন যৌবন-কাননে প্রস্ফুটিত দুটি ফুল যেন মাঠের শোভাবর্ধন করেছিল। হঠাৎ স্বামী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল, সে যেন কিছু ভুলে এসেছে। অকস্মাৎ স্বামীর ফিরে দাঁড়ানো দেখে বদরু চমকে উঠল! মধুক্ষরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

স্বামী ক্লেশের হাসি হেসে বলল, 'হয়নি কিছু তবে---।'

- তবে কি? কিছু ভুলে এলেন নাকি? না পথ ভুললেন?

স্বামী কিছুক্ষণ দাঁতে আঙ্গুল দিয়ে কি চিন্তা করল। তারপর বদরু দক্ষিণ করকমলখানি নিজ স্কন্ধে চাপিয়ে নিয়ে বলল, 'বদরু?'

বদরু আরো চমকিতা হয়ে বলল, 'কি হল বলুন?'

স্বামী কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। বদরু মনে মনে চরম ভয় পেল। অনিমেষ নেত্রে স্বামীর মুখমন্ডলের প্রতি তাকিয়ে ছিল। স্বামী আসল কথা চেপে রেখে বলল, 'যদি আমাকে কেউ এই নির্জন মাঠে খুন করে, তাহলে তুমি কি করবে?'

বদরুর মন বলে উঠল, এ আবার কি হল? হঠাৎ একি প্রশ্ন? তার ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠল। শরীর শীতল হয়ে এল। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বদরু নতুন করে চমকে উঠল। কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'ও কথা কেন বলছেন আপনি?'

স্বামী পুনরায় ক্লেশের হাসি হেসে বলল, 'তাই তো। ছিঃ! চল, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরা যাক।'

এমনি করে কিছু দূর হাঁটল। বদরু চিন্তা করছিল স্বামীর ঐ কথা নিয়ে। মাথার উপর রৌদ্র ছিল। পথিমধ্যে একটি বটবৃক্ষ দেখে স্বামী ক্লান্তি প্রকাশ করে বসে পড়ল। সাথে সাথে বদরুকে বসতে ইঙ্গিত করে রোমান্সের ঢঙে তার কোলে মাথা রেখে গা এলিয়ে দিল।

বদরু মিষ্টিমধুর হাসি হেসে বলল, 'কি সুন্দর আরামের জায়গা! কি সুন্দর বাতাস!'

স্বামী বলল, 'কি নির্জন প্রান্তর! কি সুন্দর বদরুন্নিসা! আর কি তীব্র আমার যৌন-নেশা!'

বদরু লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে উঠল, 'ছিঃ! এ ফাঁকা মাঠেও দুষ্টুমি!'

স্বামী আদর করে বলল, 'একে সে মোহন যমুনার কূল, আর সে কেলি-কদম্ব-মূল, আর সে বিবিধ ফুটন্ত ফুল, আর সে শারদ-যামিনী।'

বদরু হেসে বলল, 'জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, তাহে কুল-কামিনী----। কিন্তু এখন যামিনী নয় তো। এখন তো রৌদ্রতপ্ত দিবস।'

বদরুর চালাকিতে স্বামী খুশী হয়ে হাসল। এত আনন্দের মাঝে মাষ্টারের মনে কামড় দিচ্ছিল তার পিতার ব্যবহার। প্রসঙ্গ পাল্টে দিয়ে সে বলল, 'বদরু! যদি আমার আব্বা আমাদেরকে সত্যিসত্যিই বাড়ি ঢুকতে না দেয়, তাহলে কি করবে?'

বদরুর হৃদয়টা ধড়াস্ করে উঠল। সর্বনাশ! তাই তো, বদরু ভুলেই ছিল যে, শ্বশুরবাড়ির কারো এ বিয়েতে মত ছিল না? তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে আশঙ্কিত একটি দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। তারপর স্বামীর মাথার উপর হাত রেখে বলল, 'আপনি যা করবেন, যা করতে বলবেন, তাই করব।'

স্বামী পা ঝেড়ে উঠল। বলল, 'চল। আল্লাহ আমাদের সহায় আছেন। তুমি কেবল ধৈর্য ধরো।'

কিন্তু বদরু আর উঠতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, মাটির নীচে থেকে কে যেন তাকে ধরে বসিয়ে রেখেছে। স্বামীর হাতের উপর জোর দিয়ে উঠে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল।

গ্রাম প্রবেশ করতে স্বামী নিজ বাড়ি ইঙ্গিত করে দেখালে বদরু দেখল, অতি সুন্দর দুতলা বাড়ি, গ্রামের মধ্যে সেরা বাড়ি। মুহূর্তের জন্য তার গা-টা ছমছম ক'রে উঠল। মনে মনে বলল, 'আল্লাহ! তোমার ভরসা।'

মাষ্টার বদরুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি প্রবেশের পথে কাউকে না দেখে সরাসরি ভাবীর কামরায় গিয়ে উঠল। কথার সূত্রপাত ঘটাতে বলল, 'একটু পানি খাওয়াও তো ভাবী।'

ভাবী মনে হয় বদরুকে দেখে জ্বলে উঠেছিল। বলে উঠল, 'ও ছুঁড়িটা আবার কে?'

বদরু যেন লজ্জার সাগরে সাঁতার দিতে শুরু করল। সেই সাথে আত্মগ্লানির চরম উত্তাপে দগ্ধিতা হল। কিন্তু স্বামী হেসে বলল, 'বুঝতেই পারছ কে?'

'ও! বিয়ে ক'রে আনলে বুঝি?' - বলেই শাশুড়ীর উদ্দেশে বের হয়ে গেল। শাশুড়ী রান্নাশালে কোন কাজে ব্যস্ত ছিল। সেখানে গিয়ে ভাবী তাকে বলল, 'কই গো মা! এ দিকে এস গো। বাড়িতে রাজলক্ষ্মী এনেছেন তোমার ছেলে, একবার দর্শন করে যাও।'

শাশুড়ী জানত, ছেলে বিয়ে করেছে। আগুনের মুখে হাপরের মত ফুলতে ফুলতে ওখান থেকেই চিৎকার করে বলে উঠল, 'ও গোলামকে শুধিয়ে দেখ, যৌতুকের গাড়িটা কোথায় রেখে এসেছে। মুনিশ পাঠাতে হবে কি না?'

কথাগুলো নব-দম্পতির কর্ণকুহরে পৌঁছতেই সকলেই বিপদ গণল। বদরু অপমানে চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগল। স্বামী আগে থেকেই ধৈর্যের ভ্যাক্সিন নিয়ে রেখেছিল। সে বড় পিপাসিত ছিল, কোথা হতে পানি পান ক'রে এসে সেই গ্লাসেই পানি এনে বদরুকে পান করতে দিল।

কিন্তু বদরু প্রমাদ গণে বসেই ছিল। পানি পান করা তো দূরের কথা, পানির দিকে তাকিয়েও দেখল না। বুঝল, সদ্য মুকুলিত সুখ-প্রসূন হয়তো এখানেই ঝড়ে যাবে।

কিয়ৎক্ষণ পর খান্নাসী মা এসে ছেলেকে লক্ষ্য করে বলল, 'ঈমানদার। বিয়ে করেছ, ভালো করেছ। কিন্তু আমার ঘরে জায়গা নেই। যদি পার অন্য কোথাও গিয়ে বাসা বাঁধ। না হয় শ্বশুরের নাখরাজে চলে যাও।'

মাষ্টার জানত, তাকে তার মা রাগের মাথায় যতই কথা বলুক, তাকে তাড়াতে পারবে না। কারণ সে ছেলে সরকারী চাকরী করে। এ সংসারে তার দান ও অবদান আছে। স্বামী-স্ত্রীতে কোন উত্তরটি করার সাহস না ক'রে মুখ নামিয়ে বসে রইল। বদরুর চক্ষু থেকে ততক্ষণ বাদলের ধারাপাত ঝরতে শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে ভাবী দেবরকে উদ্দেশ্য করে ব্যঙ্গ করে বলল, 'তোমার শ্বশুর কি কি দিয়েছে হে! দেখালে না যে?'

এবার মাষ্টার মুখ খুলল; বলল, 'তোমার বাবা কি দিয়েছিল বড় ভাইকে?'

- দেয়নি আবার কি? সবই তো আমার বাপের দান।

- ঠিকই তো আমাদের কিছুই ছিল না, সব তোমার বাপের দান। কিন্তু আমি ফকীরের মত পরের দান গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই।

ভাবী ভ্রূকুটি হেনে বলল, 'আহা! শ্বশুরের আছে কত। যে বেটির বিয়ে জলসাতে দেয়, তার আবার জামাইকে দেওয়ার কি আছে?'

- কত আছে। জানো? আমার নামে জমি লিখেছে।

পণলোভী মা কোথা হতে ঝাঁটা হাতে উড়ে এসে বলল, 'তোর কপালে ঝাঁটা লিখেছে! ছোঁড়া যেন বুড়িয়ে যাচ্ছিল। ছোঁড়ার যেন বিয়ে হতো না। ঈমান দেখিয়ে ফকীর ঘরে বিয়ে করতে গেছে। ছিঃ! আমাকে গলায় দড়ি নিয়ে মরতে ইচ্ছে করে। রূপসী মাগী পেয়েছে, রূপসী! নিয়ে আয় জমি, তারপর ঘরে বাস করবি।'

মায়ের এহেন ব্যবহারে মাষ্টার অভ্যস্ত বলেই এত সহজে সকল কথা বরদাশ্‌ত্‌ ও হজম করতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। ভাবীর ইচ্ছা ছিল বোনের সাথে তার বিয়ে দেওয়া, তাই সেও হিংসায় ও নিরাশায় ছোবল মারতে কসুর করছে না। মাষ্টার সবকিছু শুনেও কানকে ঢোল করে বড় ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষা দিতে থাকল।

কিন্তু বদরু? তার কি সে অভ্যাস ছিল? মোটেই না। এ যেন এক আলাদা দুনিয়া। মা হয়ে এত মর্মভেদী কথা একজন শিক্ষিত ছেলের কলিজায় গাঁথতে পারে, তা বদরু জীবনে এই প্রথম শুনল! মা যে ছেলের প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করতে পারে, তা সে আজ প্রথম চাক্ষুষ প্রমাণ হিসাবে শাশুড়ীকে দেখল। কেউ প্রেম ও ব্যভিচার ক'রে কোন মেয়েকে অবৈধভাবে তার ঘর থেকে বের করে আনলেও এত কথা শুনতে হয় কি না, তা তার জানা ছিল না।

শাশুড়ী-জায়ে কথা বলেই যায়। তাদের কথার বাঁধুনি ও বিঁধুনিতে গায়ে আগুন লাগে। কিন্তু ধৈর্যশীলার ভূমিকায় তার এ জীবনযাত্রার মঞ্চে পূর্ণ দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে, নচেৎ জীবন বিফল যাবে। বদরু মনে মনে বলল, 'তুফানে ছেড়ো না হাল, নৌকা হবে বানচাল।' কথার আঘাতে তার হাত-পা যেন অবশ হয়ে পড়ল। কোন কথা বলল না, বলাও ঠিক নয়। 'অবাক মুখে বাক্‌ সরে না কথা কবে কি?' আগুনে ঘি ঢেলে দ্বিগুণ ক্ষতি আনবে কেন? তার কারণে তার নিজের চাইতে স্বামীই যে বেশী অপমান সহ্য করছে, তা দেখে হৃদয়ের যত সুখ-আশাকে সে হৃদয়ের মাঝেই চুরমার করে দিল। পুরুষ মানুষ নীরবে এত অপমান সহ্য করতে পারে, সে কথাও বদরুর জানা ছিল না। ধর্মপরায়ণ মাষ্টার স্বামী মায়ের প্রতি কোন প্রতিশোধমূলক অসদাচরণ করছে না দেখে সত্যই সে সন্তুষ্ট হল। শুধু ভাগ্যে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে পুতুলটির মত এক জায়গায় বসে রইল।

মা চলে গেল। ভাবী নতুন জায়ের কাছে বসে কোন কুশলাদি জিজ্ঞাসা না ক'রে বলল, 'কি হে তোমার বাপের কিছু জমি-জায়গা আছে তো? নইলে বাপু এখানে

তোমার স্থান হবে না।'

বদরু অপমানে মুখমন্ডলের অবগুণ্ঠন আরো সুদৃঢ় করে নিল। বিশেষ করে সে এ বাড়ির মাত্র এক ঘন্টার নতুন বউ। কোন আদর নেই, আপ্যায়ন নেই, বরণ নেই। উল্টে বড়লোকি হিসাব, ছোটলোকি প্রশ্ন। উত্তর না দিলেও দোষ। গলার ভিতরে ক্ষীণ শব্দে বলল, 'আছে।'

মাষ্টার আগের তুলনায় যেন একটু গরম হয়ে উঠল। বলল, 'ভাবী! তোমরা আমাদেরকে কি মনে করেছ বল তো?'

ভাবী চায় না যে, দেবর চটে যাক। চট্‌ করে বলল, 'মনে কিছু করি নাই। তোমার মা-বাপের মন জানো তো? আমাকেও কত কথা শুনতে হয়েছে এত আনার পরেও!'

এমন সময় আবার মাতা ঝড়ের মত উড়ে এসে বলল, 'কই গো বউ মা! দেখ্‌গা তোর মুঙ্গলী মরে গেল। আমার ঘরে লক্ষ্মী ঢুকেছে যে। আমার পোড়া কপাল। রাক্ষসী নিয়ে এসেছে আমার ঘরে। এইমাত্র ঘরে পা দিল, আর এক্ষনি বিপদ। ও ছাই কপালীকে নিয়ে তুই অন্য কোথাও চলে যা।'

বড় বউ মুহূর্তে ছুটে গিয়ে দেখল, রান্নাশালে মুঙ্গলী চিৎকার করে কাঁদছে। ভাতের মাড়ে হাত ডুবিয়ে তার হাত পুড়ে গেছে। কাঁদকাঁদ হয়ে সে মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে শাশুড়ীর দোহারী হয়ে বলল, 'রাক্ষসীই বটে! নইলে এতক্ষণ কেন হয় নাই? ওর দ্বারা সব সর্বনাশ ঘটবে। সর্বনাশীকে নুরো বিয়ে করে এনেছে ফকীরের ঝুলি নেবে কাঁধে!'

ভিখারিনী এসেছিল ভিক্ষা করতে। বলল, 'না মা! তাই কি হয়? তোমার মেয়ের কপালে ঐটুকু ছিল। দেওর গরীবের মেয়ে বিয়ে করে এনেছে বলে কি হয়? ও কথা তোমার যোল আনা ভুল।'

বড় বউ অগ্নিমূর্তি হয়ে বলে উঠল, 'বের হ এ বাড়ি হতে। কথার মাঝে কথা কাটে। কেউ যেন ওকে সাক্ষী মেনেছে? খবরদার এ বাড়িতে ভিক্ষা করতে আসবি না।'

এবার বদরু ঘোমটা খুলে লজ্জা ঠেলে ছুটে এসে বড় বউ-এর কোল হতে মুঙ্গলীকে নিতে চাইল। বড় বউ ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'সর সর! আর মায়া দেখাতে হবে না। কুলক্ষণা মেয়ে! ঘরে পা দিলি, আর আমার কপালে আগুন লাগল।'

তবুও বদরু মানল না। জোর করে তার কোল থেকে মুঙ্গলীকে নিয়ে আদর করতে লাগল। মাষ্টার মলম লাগিয়ে দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে আরাম পেয়ে সে ঘুমিয়ে গেল।

কিন্তু বদরুর জন্য কি কোন মলম আছে? এখনো শ্বশুর-ভাশুর বাকী আছে। কিন্তু কল্যাণ যে, তারা মাষ্টার ও তার স্ত্রীর প্রতি গুমুস-গামুস ছাড়া ঐ বাড়ির মেয়েদের মত জিভের চাবুক মারেনি অথবা মাষ্টারের ওজন থাকার জন্য মারতে পারেনি। ফলে বদরুকে 'বউ' বলে মেনে নিতে সবাই বাধ্য হয়েছিল।

(১৭)

মাষ্টার আব্দুর নূর বাড়িতে ছিল না। স্কুলটা বেশ খানিক দূর হওয়াতে প্রতিদিন বাড়ি আসা-যাওয়া সম্ভব হত না। বদরুর তাতে খুব কষ্ট হত। কারণ, এ সংসার যুদ্ধ-ময়দানে স্বামী তার ঢাল স্বরূপ। সে বাড়িতে থাকলে শাশুড়ী মা খুব একটা কড়া কথা বলতে পারে না। কিন্তু না থাকলে তার দুঃখের নিশি আরো ঘোর হয়ে নেমে আসে।

সেদিন বদরু ফজরের নামায পড়ছিল। বাড়ির মধ্যে নামাযী বলতে কেবল সে আর তার স্বামী। বাকী আটকী, খাটকী, তিনশ' ষাটকী। শ্বশুর মাঝে মাঝে পড়ে ও ছাড়ে। বড়লোক বলে এলাকার মাদ্রাসার আদায়কারীরা তাকে চেনে, আর তাদের খাতিরে অথবা পজিশনের খাতিরে কখনো কখনো স্বার্থের খাতিরে তাকে নামায পড়তে হয়। বাকী শাশুড়ী ও বড় বউ হয়তো নামায জানেই না। শাশুড়ী একটু সকালে উঠেই এ ঘর সে ঘর দেখতে দেখতে বদরুর নামায দেখে যেন তার পায়ের রক্ত মাথায় চড়ে গেল। বারো ভোল্ট্ ব্যাটারীর মাইক গলা নিয়ে বলে উঠল, 'বাসী কাজ-কম্ম সব বাকী। আর হাজী বিবি এখন তসবীতে বসেছেন। ও পরেজগারি আমার ঘরে চলবে না। কাজ বাদ দিয়ে নামায পড়লে খোদা তোকে সকাল বেলার চা-টা খাইয়ে দেবে না।'

যেদিন হতে বদরু এ বাড়িতে এসেছে, সেদিন হতেই শাশুড়ী ও বড় বউ 'লাট-সাহেবা' হয়ে গেছে। গরীবের মেয়ে বাঁদী হয়েই থাক ও খেটে যাক - এই তাদের ইচ্ছা। সুতরাং সেদিন হতেই সংসারের প্রায় সকল কাজ বদরুই একা ক'রে যায়। আর যেটুক করার অর্থাৎ ভুল ধরা ও ফরমায়েশ করার থাকে, সেটুক বাকী দু'জন করে যায়।

নব পরিণীতা বদরু তাতে বড্ড কষ্ট পায়। তবুও স্বামীর নির্দেশ মত সাধ্যানুযায়ী নিজের কর্তব্য-কর্ম করে যায় এবং আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া জানায়। কেবল রঙিন ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানের কালিমাকে সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বরণ করে নেয়।

পিতামহীর শাসানি শুনে দুতলা থেকে কাঞ্চন ছুটে নেমে এল বদরুর রুমে। দেখল, ছোটমা নামাযের মুসাল্লা তুলে আঁচলে চোখ মুচ্ছে। দুঃখে কাঞ্চনের নয়ন-যুগল অশ্রুটলমল হয়ে উঠল। সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ছোটমা কি হল?'

বদরু বলল, 'কি আর হবে মা? কাজ পড়ে আছে।'

কাঞ্চন ছোটমাকে মনে মনে খুব ভালবাসে। আর ছোটমাও কাঞ্চন ও তার ভাই-বোনকে কম স্নেহ করে না। কাঞ্চন ছোটমায়ের সমর্থনে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলল, 'দাদীমা না চরম জাহাঁবাজী মেয়ে। যেন শাঁকচুন্নীর মা! চল ছোটমা! দু'জনে থালাবাটি ধুয়ে আনি।'

ছোটমা মনে মনে খুশী হলেও কি ভাবল। তারপর বলল, 'না মা! তোমাকে যেতে হবে না, আমিই যাই।'

তবুও কাঞ্চন জোর দিয়ে বলল, 'না, তোমার একা কষ্ট হবে।'

মনে হয় ও বাড়ি হতে বড় বউ শুনতে পেয়েছিল। হেঁকে বলে উঠল, 'কাঞ্চন?'

সেই হাঁকে কাঞ্চন সহ বদরু চমকে উঠল। কাঞ্চন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছোটমায়ের অশ্রুসজল চোখের দিকে অক্ষমার মত তাকিয়ে রইল। বদরু বলল, 'যাও মা! তোমার মা ডাকছে।'

সকাল বেলার কাজকর্ম পারিপাট্যের সাথে সেরেও বদরুর বিশ্রাম নেই। এরপর আসছে রান্নার সময়। নিজ কক্ষে গিয়ে দেখল, কাঞ্চন তেলের শিশি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'কি মা কাঞ্চন?'

কাঞ্চন ছোটমায়ের খুঁট ধরে বলল, 'মাথা বাঁধব। বেঁধে দেবে না? স্কুল যাব। আজ ভালো করে চুটি গেঁথে নেব।'

বদরু বলল, 'তোমার মা বা দাদীমা কিছু বলবে না তো?'

কাঞ্চন বলল, 'কেন? কি বলবে?'

বদরু চাপা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি গরীবের মেয়ে মা। বিনা পণের বউ। পদে পদে দোষ মা আমার!'

দুঃখভরা হৃদয়ের কথা কিশোরী কাঞ্চনের কচি হৃদয়ে আঘাত করল। কিন্তু তারই বা কি করার ছিল? সে ক্ষণিক নীরব থেকে উন্নাসিকতার সুরে বলল, 'না ছোটমা! ওরা কিছুই বলবে না। তাড়াতাড়ি বেঁধে দাও। স্কুলের টাইম হয়ে আসছে।'

বদরু কাঞ্চনের মাথা বাঁধতে বসল। কাঞ্চন বলল, 'ছোটমা! তুমি বড় সুন্দর ক'রে মাথা বাঁধতে পার। আর মা যে কেমন ক'রে বাঁধে, ভালোই লাগে না। গেঁয়ো গেঁয়ো লাগে। সত্যিই আমি দেখছি, এই বড়লোক ঘরের গেঁয়ো মানুষরা বেশীর ভাগই অসভ্য হয়। কোন প্রকারের একটু সাজগোজ করলেই ওদের সব শেষ হয়ে যায়। দাদীমার অবস্থা দেখছ তো? একটা কেমন ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনদিন সাবানও হয়তো মাখে না।'

বদরু বলল, 'ছিঃ! বড়দের সমালোচনা করতে হয় না।'

কাঞ্চন বলল, 'হুঁঃ! তারা আবার বড় হল, যাদের কাজ ছোট?'

এমন সময় বড় বউ কাঞ্চনকে ডাকতে ডাকতে এসে হাজির হল। দেখে মনে হল তার দেহের উত্তপ্ত তাওয়াতে যেন পানি পড়েছে। বলে উঠল, 'তুই আমার ছেলেমেয়েদেরকে খারাপ করবি বুঝলি। গায়ে তেল, পায়ে তেল ক'রে সবকে মাথায় উঠিয়ে দিবি। আর এ মাগির দৈনিক মাথা বাঁধা। চোদ্দ বছরের ধাড়ি! দৈনিক মাথা বেঁধে চ্যাংড়া মাতাবে! অত তেল-ফিতে আমার নাই। দরকার হলে তোর ছোটমাকে বল, বাপের ঘর থেকে একটিন

তেল নিয়ে আসবে।'

বদরু সহাস্যে কাঞ্চনকে সম্বোধন ক'রে বলল, 'আমার আব্বা তো গরীব মানুষ। তোমার ছোট আব্বাকে বলবে, এনে দেবে।'

এক ঝড়ের মুখে দাঁড়াতেই আর এক ঝড় শাশুড়ী উড়ে এসে উপস্থিত হল। বদরু তখন কাঞ্চনের মাথা সেরে ঐ চিরুনী দিয়ে নিজের চুলগুলোও কেবল সোজা করে নিচ্ছিল। শাশুড়ী বলল, 'বিবি সাহেবা সকাল বেলা থেকে মাথায় পেটি কাটতে লেগেছে। কত বেলা হয়ে গেল এখনো চুলো ধরল না। এত যদি করবি, বাবাকে বলে পাঠা, কাজের জন্য একটি দাসী দিয়ে যাবে।'

কাঞ্চন ছোটমায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ের উদ্দেশে বলল, 'বাবারে সকাল থেকে ছোটমাই তো সব করল। তোমরা খানিক চুলোটা ধরিয়ে দাও না। তারপর ছোটমা রান্না চড়াবে।'

মা ঝংকার দিয়ে বলে উঠল, 'এই মাগী! তুই স্কুল যা। ফিরে আয়, তারপর তোর দৈনিক মাথায় শিঙ্গার করা বার করছি।'

দুই খান্নাসীর কথায় কাঞ্চনও বড় লজ্জিতা ও অপমানিতা হল। মা হয়ে কিভাবে 'চ্যাংড়া মাতানো'র কথা বলতে পারল তা সে কল্পনাই করতে পারল না। একটু সভ্য-ভব্য হয়ে থাকলেই কি চ্যাংড়া মাতানো হয়? এতবড় অপবাদ মা যখন দিতে পারছে, তখন অন্য কেউ যে দেবে না তা সহজে অনুমেয়। এ নিয়ে মায়ের প্রতি তার বড্ড ধিক্কার এসে গেল। রাগে মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো ক'রে সেখান হতে চলে গেল।

বদরু বড় শোক-সন্তপ্ত ও দগ্ধিত মনে রান্না চড়িয়ে কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবছিল। আজ যদি তারা বড়লোক হতো, তবে কি তার ভাগ্য এত মন্দ হতো? পিতা যদি পণ দিয়ে বিয়ে দিতে পারত, তাহলে মনে হয় এত বড় বাড়ির বউ চাকরী-ওয়ালার স্ত্রী হয়ে এমন দাসীর মত খাটতে হতো না এবং এমনভাবে উঠতে-বসতে সকলের কাছে গালি বা কটুকথা শুনতে হতো না। চারিদিক অন্ধকারের মাঝে একটুখানি আশার আলোয় তার সংসার যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। স্বামী মন্দ নয়। তারই সুখের জন্য সকল দুঃখকে সে বরণ করতে দ্বিধা করছে না। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসের তো একটা সীমা আছে। উঠতে-বসতে এত গঞ্জনা, ভালো কথা ও কাজেও এত ভর্ৎসনা কে সহ্য করতে পারবে? পক্ষান্তরে সংসার ভাঙ্গার কুমন্ত্রণাও সে দিতে পারছে না। আর স্বামীও পিতৃসম্পদের এত কিছু ত্যাগ করতে রাজী নয়। সুতরাং তাকে এ ঘরেই শত কামড়ের মাঝেও মাটি কামড়ে থাকতে হবে। কেবল এই জন্যে যে, তার পিতা জামাইকে একটি কানা-কড়িও দেয়নি। সুতরাং সে এ বাড়ির একটি দাসী। টাকা দিতে পারলে তবেই তো সে 'বউ' হতে পারত!

হঠাৎ রান্নাশালে শাশুড়ী মা এসে ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, 'ঝিমুচ্ছিস যে, ঘুমুচ্ছিস নাকি?

এখনো ভাত হল না? বলি কাজে একটু গা লাগা কেন?'

বদরুর অন্তরে কথাগুলি তীরের মত বিঁধল। এই মাত্র ভাত চড়ানো হয়েছে, এখনো পানি ফুটল না, আর সঙ্গে সঙ্গে এসেই কি না নানা ভর্ৎসনা। বদরু অবাক হল। চিন্তা করল, হক কথা বলবে কি না। কিছু না বললে যেন বেড়েই যাচ্ছে। সে বলেই ফেলল, 'দাঁড়ান মা! এই তো চড়ালাম। এর মধ্যেই হয়ে যাবে? এ তো মেশিনের কাজ নয়।'

বলা কি বিপদ! শাশুড়ী মাতা লাফিয়ে লম্বা গলা ক'রে বলে উঠল, 'ও মা! মাগীর কথা দেখ! যেন একেবারে ইঁচড়ে পাকা। বলি রান্না আমাকে শিখাতে এসেছিস না? রান্না করতে জানিস? না ভাতারের ভাত ঠিক রাখতে রান্না করছিস? আজ ছোট থেকে এই বয়স কাল পর্যন্ত রেঁধে এলাম। আজ বলতে গেলে বলে কি না, 'মেশিন নাকি?' ছোটলোকের বেটি কি আর জানে? ঘরে রেঁধেছে, না ভাত পেয়েছে। উপোস করা অভ্যাস যাদের, তারা আবার পাঁচ সের চালের ভাত রাঁধতে পারে?'

ধীর পানিতে পাথর কাটে। তাছাড়া শাশুড়ীর কথায় বদরুর হৃদয়টা পাথরের মত জমে গিয়েছিল। হাজার কথা বললেও নির্বিবাদে সহ্য ক'রে বলল, 'বেশ মা! যদিও আপনার ঘরে নতুন শিখছি, তবুও সময় তো চাই। এই তো দশ-পনের মিনিট আগে রান্নার ফর্দ কষলেন। একটু সময় দেন।'

'বেশ কখন হয় দেখি।' বলে অন্যত্রে গমন করল।

বিকাল বেলায় ক্লান্ত হয়ে আসরের নামায পড়ে বদরু একটু শয়ন করেছিল। আগের মত এখন ঠিক সময়ে নামায পড়া হয় না। কখনো যোহর-আসর এক সাথে, মাগরেব-এশা জমা ক'রে পড়তে হয়। শাশুড়ীর কথার ভয়ে কুরআন শরীফে তো হাত দিতেই পায় না। চোখ লাগার আগে কাঞ্চন স্কুল থেকে এসে তার রুমে প্রবেশ করল। দেখল, সে খুশীতে যেন হাঁপাচ্ছে। উঠে বলল, 'কি ব্যাপার কাঞ্চন? স্কুল থেকে এলে?'

কাঞ্চন বলল, 'হ্যাঁ।'

তারপর একটু হেসে বলল, 'ছোট-আব্বা আসছে, ছোটমা! আজ শনিবার।'

বদরু লাফিয়ে উঠল। দুঃখিনীর মনেই ছিল না যে, আজ স্বামীর আসার দিন। মনটা প্রফুল্ল অথচ বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

কাঞ্চন পুনরায় বলল, 'ছোট-আব্বাকে সব বলে দেবে, তোমাকে গালি দিচ্ছিল।'

বদরু বলল, 'না মা! দরকার কি?'

কাঞ্চন 'দাঁড়াও আমি আসি' বলে চলে গেল।

সংসারের সকল কর্ম সেরে স্বামীর জন্য বিছানা ক'রে বদরু নামায পড়তে গেল। নামায হলে স্বামীর আহবানে বিছানায় গিয়ে শয়ন করল। হঠাৎ বাইরে থেকে শব্দ এল, 'কই গো ছোট বউ? সূর্য ডুবতে না ডুবতেই শুতে গেলি যে। আক্কেল জ্ঞান কিছু আছে? সদর দরজা

এখনো খোলা---।'

স্বামী কথাটি ভালোরূপেই শুনল, কিন্তু কিছুই বলল না। বদরুকে দরজা লাগিয়ে আসতে আদেশ ক'রে কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

ফিরে এসে বদরু স্বামীকে সন্তুষ্ট করে তার কাছে বায়না ধরল। বলল, 'আমার মনটা ভীষণ খারাপ করছে। একবার আব্বা-দাদুকে দেখে আসতাম।'

স্বামী বলল, 'এখানে থাকতে কেমন লাগছে?'

বদরু চুপ ক'রে রইল। স্বামী পুনরায় বলল, 'ভালো লাগে না, না?'

বদরু গলার ভিতরে বলল, 'না, হ্যাঁ। আমার কোন অসুবিধে নেই। আপনার জন্য আমি জঙ্গলেও বাস করতে পারি।'

স্বামী বলল, 'আমি জানি বদরু। আসলে এখানকার পরিবেশ বড় তিক্ত। ফলে এ পরিবেশে যেই আসবে, সেও তেঁতো হয়ে উঠবে। আচ্ছা মা খুব বকে, না?'

বদরুকে আর উত্তর দিতে হল না। হঠাৎ আবার মাতা চিৎকার করে বলে উঠল, 'মাগীর কাজের কোন শ্রী আছে নাকি? ছাগলগুলো এমন করে বেঁধেছে যে, খুলে গিয়ে পুঁই গাছগুলো সব খেয়ে ফেলেছে। ভাতারের নেশায় কোন কাজ মন দিয়ে করে নাকি!'

স্বামী শুনে সবই বুঝল। ধীরে ধীরে উঠে ভদ্র মানুষটির মত বলল, 'আমার সামনে এমন কথা বলছ মা? তোমার মান-সম্ভ্রম লাজ-লজ্জা কিছু আছে? ছোটলোকের মত যা তা কথা বলতে একটু লজ্জা করা উচিত।

মাতা ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দিল, 'ছোটলোকের মেয়েকে বিয়ে করে এনে আমাকে ছোটলোকি চিনাচ্ছিস। লজ্জা তুই কর। তোর শ্বশুর যদি পাঁচলাখ টাকা দিত, তাহলে তোর বউকে রাণী করে রেখে দিতাম। সে চাস্ তো আমার বাড়িতে নয়।----'

আব্দুন নূর বলল, 'দেখ, তুমি আমার মা। কড়া কথা বলার বা ঝগড়া করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু তুমি যৎসামান্য জমি-জায়গা বা টাকা-পয়সার লোভে গরীবের প্রতি অহংকার দেখাচ্ছ। ফল তোমার ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।'

ঠিক এমন সময় পিতার হস্তক্ষেপে সবাই চুপ হয়ে গেল।

(১৮)

সোমবার সকালে আব্দুন নূর মাতাকে বলল, 'মা কাঞ্চনকে সাথে ক'রে ওর ছোটমাকে একবার তার বাপের ঘরে রেখে আসি। দু-একদিন পর আনা যাবে।'

উত্তরে মাতা কিছু বলল না।

পুত্র পুনর্বার বলল, 'কি বলছ মা! তাই হবে নাকি?'

মাতা এবারে বলল, 'যা মনে আছে তাই কর্ বাপু! এ সময়ে কাজের যত ঝামেলা। আর কি বলব?'

কথাটা বলেই মুখটাকে বাংলা পাঁচের মত বাঁকা করে দিল। মাষ্টার বলল, 'দু-একদিন বেড়িয়ে আসবে।'

মাতা ক্ষুণ্ন মনে বলল, 'তাই করবি।'

মাষ্টার কাঞ্চনদের কামরায় গিয়ে কাঞ্চনের উদ্দেশে বলল, 'কাঞ্চন সেজে নে রে। ছোটমাদের বাড়ি যাবি।'

ছোটমাদের বাড়ি ছোটমায়ের সাথে যেতে হবে শুনে কাঞ্চন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সোহাগভরে মাতাকে বলল, 'মা! ছোটমাদের বাড়ি যাব।'

মাতা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কি? ছোটমাদের বাড়ি?'

কাঞ্চন বলল, 'হ্যাঁ গো। ছোট আব্বা বলল। ছোটমার সাথে যাব।'

মাতা বলল, 'না, তোর ছোটমা যাবে না।'

কাঞ্চন বলল, হ্যাঁ যাবে।'

বড় বউ শাশুড়ীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁ গো মা! ছোট বিবি মায়ের ঘর যাবে নাকি শুনছি।'

শাশুড়ী অধর উল্টিয়ে বলল, 'তাইতো বলল নূরো। কি আর করি বল্। ছেলেরা কি আর কথার বশে আছে?'

বধূ বলল, 'না মা, তা হবে না। গেলেও একমাস পরে যাবে। এখন অত্যন্ত কাজের চাপ! এত কাজ আমরা করতে পারব না।'

কাঞ্চন দয়ার্দ্রকণ্ঠে বলল, 'নতুন বউ একবার বাড়ি যায়নি, তা একবার যাবে না? ওর বুঝি মা-বাপের জন্য মন কাঁদে না না?'

মাতা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠল, যা ছুঁড়ি! কিছু বোঝে না আর মুখ লড়াবে। এত কাজ তুই করে যাবি?'

কাঞ্চন কাউকেও ভয় করে না। রোষভরা কণ্ঠে পুনরায় বলল, 'আহা! কত আমার কাজ! কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই। তাতে আবার এত কাজ! বলি, দুটো রেঁধেও খেতে পারবে না? ছোটমা যখন আসেনি তখন কি ক'রে চলছিল? নিজের যখন মাকে মনে পড়ে, তখন ছোট মেয়ের মত ঘরের কোণে চোখের পানি ফেলে। আর পরের বেলায় বুঝি সে রকমটা নয়?'

- এ ছুঁড়ির কথায় কেউ পারবে না। গালে এক থাপ্পড় মারা হয়। যা এখান থেকে, দূর হ বলছি।

কিয়ৎক্ষণ পর যখন বদরু যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেল, ঠিক কাঞ্চনও সেই সময়

প্রসাধন নিয়ে বসেছিল। মাতা দেখে বলল, 'ওকি করবি?'

কাঞ্চন মুচকি হেসে বলল, 'কেন? ছোটমাদের বাড়ি যাব।'

মাতা বলল, 'না, তোর যাওয়া হবে না। ইস্কুল কামাই হবে।'

কাঞ্চন মুখ নামিয়ে বলল, 'তা হোক, আমি যাব। আর হ্যাঁ, মাঝে তিনদিন ছুটি আছে তো।'

মাতা বিরক্ত হয়ে বলল, 'না না, যাওয়া হবে না। মুঙ্গলীকে ধরবে কে?'

- দাদীমা কি করবে?

মাতা জ্বলে উঠল। ছোট বউ-এর প্রতি তার হিংসা কম নয়। প্রথমতঃ সে তার থেকে অনেক বেশী সুন্দরী। দ্বিতীয়তঃ সে গরীবের মেয়ে অথচ মর্যাদায় তার থেকে বড়। আর তৃতীয়তঃ সে চলে গেলে যত কাজ তার ঘাড়ে চড়ে বসবে। অথচ থাকলে বেশ গিন্নীপনা চলে। সুতরাং যত রাগ সমস্ত গিয়ে পড়ল বদরুর উপরে। ঘৃণাভরে কন্যাকে তার সংস্রব হতে দূরে রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু কন্যাও বড় এক জিদে। সে কোন রকমেই মানবে না। তার যাওয়া চাইই।

মাতা পুনরায় বলল, 'তবে আর ঘর আসতে পাবি না।'

মুখ নিচু করেই কাঞ্চন বলল, 'আসব না।'

- তোর আব্বাকে বলে চরম শাস্তি দেওয়া করাব।

- আব্বা আমাকে কিছুই বলবে না।

মাতা এবার চুপিচুপি কন্যাকে বলল, 'এই পাগলী! ওরা যে খুব গরীব! ওদের ঘরে গিয়ে কোথায় থাকবি, আর খাবিই বা কি?'

কাঞ্চন চমৎকৃতা হয়ে বলল, 'বা-রে! গরীবরা খায় না বুঝি? ছোটমা যা খাবে, আমিও তাই খাব, ও যেখানে থাকবে, আমিও সেখানে থাকব।'

মাতার রাগ চরমে উঠল। বলল, 'চলে যা এ বাড়ি হতে। খবরদার আর আসবি না। এলে তোর পা ভেঙ্গে ফেলব।'

- বেশ বেশ! আসব না।

- বেশ তো মেয়ে! তারা নিজে ভাত পায় না, আর তোকে খাওয়াবে?

- তোমাদের মন নীচ। তারা যা খায়, তা তোমরা খাও না।

আর যায় কোথা? 'মেয়ের কথা দেখ? কত বাড়া বেড়েছে দেখ?' বলেই পড়ে থাকা একটি কঞ্চি নিয়ে কাঞ্চনের কাঁচা দেহে প্রহার করতে লাগল। আঘাতের জ্বালায় মেয়ে 'বাবারে, বাবারে' বলে কাঁদতে শুরু করল। বদরু শব্দ শুনে দৌড়ে এসে বড় বউ-এর হাত থেকে কঞ্চিটা কেড়ে নিল। বিড়বিড় করতে করতে শাশুড়ী এল ছুটে। পুরুষরা সে সময় বাড়িতে ছিল না। বড় বউ রোষানলে জ্বলে বলে উঠল, 'মাগী বাপের জন্য মরে যাচ্ছে। বাপ যদি এত দরদের তো বাপ দেখতে আসে না কেন, ট্যাক্সি পাঠায় না কেন? আবার এ মেয়েটাকেও নাচিয়েছে। বাপের তালুক আছে, তাই ভাল-মন্দ খাওয়াবে। যাচ্ছিস্ তুই একা যা। পরকে কেন আবার সাথ করা?

বদরু লজ্জা, অপমান ও ক্ষোভে ধীরে ধীরে সেখান হতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে এল। আহা! সে কথার আঘাত কি আর পাষাণেরও সহ্য হবে?

হঠাৎ কোন কাজে স্কুলে যেতে হবে মাষ্টারকে। সুতরাং তার শ্বশুরবাড়ি আর যাওয়া হল না। এদিকে মহিলা মহলে কি তামাশা চলছে তাও সে জানতে-বুঝতে পারল না। সে বদরুকে বলল, 'বদরু! আমার আর যাওয়া হচ্ছে না। তুমিই বরং কাঞ্চনকে নিয়ে বিকালে চলে যেও। দু'দিন থেকে চলে এসো।'

বদরু বলল, 'কাঞ্চনকে ওর মা যেতে দেবে না।'

মাষ্টার বলল, 'হ্যাঁ, যেতে দেবে। আমি বলেছি।'

বদরু বলল, 'আপনার এত পাওয়ার? ভাবীকে কি আপনার স্কুলের ছাত্রী পেয়েছেন যে, বললেই মেনে নেবে? বড়লোকের ব্যাপার। মেয়েকে গরীব ঘর পাঠাবে না সে।'

- অবশ্যই পাঠাবে। আমি আবার বলে আসছি।

সংসারেও যে বড় রাজনীতি চলে, সে কথা নব-দম্পতির বুঝতে দেরী লাগে। দেবরকে উত্তর না করলে দেবর ভাবল, এ হল তার মৌন-সম্মতি। অতঃপর সে বাস ধরার উদ্দেশ্যে মা ও বদরুর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

'বাপের বাড়ির পা, কেলে সাপের ছা।' নীরবে সব সহ্য করা গেল, কিন্তু বাপের বাড়ি না যেতে পাওয়ার গ্লানি বদরু সহ্য করবে কি ক'রে? স্বামী চলে গেলে সে বুঝল, তার যাওয়া আর ভাগ্যে জুটল না। স্বামীর প্রতি এই প্রথমবারের মত আস্থা হারিয়ে ফেলল। তবুও তার আশাটুকু যেন মনের মাঝে বিরাজ করে। মনে হয়, কখন বিকাল হবে? সকাল থেকে এই সামান্য দিনটুকু আর কাটে না, কাটতে চায় না! কাজকর্ম করতে করতে সে চিন্তা করে, ঘরে গিয়ে পিতা-পিতামহের সাথে কি কথা বলবে? দুখের কথা জানাবে, না সুখের কথা? কোন্ সুখ-সাগরের গল্প সে করবে?

বিকাল হয়ে গেল। আসরের নামায পড়ে বদরু ভাবছিল, যাওয়ার কথা সে আর কিভাবে তুলবে? কাঞ্চনও ভয়ে আর এদিকে আসেনি। আব্বা-দাদুর জন্য মনটা কেঁদে উঠল। চক্ষু থেকে অশ্রু বয়ে যেতে লাগল গন্ডে। হায়রে! বিনা পণের বিয়ে বলে কি এত অপমান, এত গঞ্জনা, এত কষ্ট সইতে হয়?

কিছুক্ষণ পর শাশুড়ী মা এসে কাজের ফরমায়েশ করলে সে নিশ্চিত হল যে, বাপের ঘর না গিয়েই তাকে বরপণ আদায় করতে হবে। বরপণ দিতেই হবে মেয়ের বাবাকে, সে না পারলে মেয়েকে, তাতে তা যেমন ক'রেই হোক!

(১৯)

এতদিন গত হল, বদরুর ভাল-মন্দ কোন সংবাদ নেই। মাতাহারা দুঃখিনী মেয়েটি সুখ পেয়েছে নাকি দুঃখেই দিবানিশি করছে তা আর জানা গেল না। ধারণা আছে যে, জামাতা অমায়িক, মহানুভব। মেয়ে সুখেই থাকবে। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে সে হয়তো একবার দেখা করতেও এল না। তবে ইতিমধ্যে বিয়াই মশাই এসে দেখা করে গেছেন এবং বলে গেছেন, 'মেয়ে সুখেই আছে। ডাক-সাইটে বড়লোকের ঘরে কেউ সুখ না পেলে কোথায় আর সুখ পাবে?' বাড়ির মত প্রকাশ করে এ কথাও বলেছেন যে, তিনি পণ না নিয়ে কারো বিয়ে দেননি। ঝোঁকের মাথায় নূর বিয়ে করে ফেলেছে। এখন টাকা দিতে না পারলেও কম ক'রে চার বিঘা জমি তার নামে লিখে দিতে হবে। আর জমির কথা নূরের কাছে শুনেছেও বটে।

তাহলে কি জামাতারও জমির লোভ আছে? এ কথা বিশ্বাস্য না হলেও অগ্রাহ্য নয়। কিন্তু দেবে কি? মাত্র দশ কাঠা জমি, দুই জন খেতে। তা হতে চার বিঘা জমি কোথায় পাবে? উত্তরে বিয়াই বলেছেন, যদি ঐ দশ কাঠা জমিই এবং ভিটাটুকু তার নামে লিখে দেওয়া হয়, তাহলেও যথেষ্ট হবে।

নচেৎ বুঝা গেল মেয়ে স্বামীর ঘর করতে পারবে না। বিয়াই মশায়ের অবস্থা বলছে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন যা পাই, তাই লাভ। পড়ে পাওয়া টাকা চৌদ্দ আনাই লাভ!

যেহেতু মেয়েটি ছাড়া তাদের উত্তরাধিকারী কেউ নেই, সেহেতু তাতে সম্মত হলেও কিছু এসে যায় না। বিয়াই না চাইলেও পেত। কিন্তু তার নিজের হস্তগত হত না তাই। যাই হোক, উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে লেনদেনের কথা পাকা করল।

এক সপ্তাহ পর আজ হঠাৎ পিতা পুত্রকে বলল, 'সলীম! আজ আমি ভারী খারাপ স্বপ্ন দেখেছি রে! দেখলাম, আমার বদরু জরা-জীর্ণ শাড়ী পরে ঘরের কোণে বসে কাঁদছে।'

বলেই বৃদ্ধ কেঁদে ফেলল। তারপর বলল, 'ওরে! আমার মনে হয়, সে সুখ পায়নি। তাকে একবার দেখে আয়। তাকে একবার নিয়ে আয়। না হলে আমি বাঁচব না।'

পুত্র বলল, 'বেশ, আজই যাব।'

সলীমুদ্দীন মেয়ের বাড়ি রওনা দিল। গ্রামে প্রবেশ করতে এক বালিকার সাথে সাক্ষাৎ হল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, মাষ্টার আব্দুন নূরের বাড়ি কোথায়?

বালিকা বলল, 'ঐ যে ঐ বাড়িটা? কি ব্যাপার? কেন যাবেন?'

- ঐ বাড়িতে আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে যে।
- ও, সেই মাষ্টারের সাথে বুঝি?
- ঠিক বলেছ।

শুনেই কাঞ্চন দ্রুতপদে বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। সর্বাগ্রে ছোটমায়ের কামরায় উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ছোটমা একটা সুখবর আছে। তোমার আব্বা আসছে!'

বদরু চমৎকৃতা হয়ে বলল, 'আমার আব্বাকে তুমি চিনলে কি প্রকারে?'

কাঞ্চন আহ্লাদ ভরা গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ গো! আমি জিজ্ঞেস করলাম যে। এস তোমাকে দুতলা থেকে দেখিয়ে দিই।'

কথাটি সত্য হোক অথবা মিথ্যা, বদরুর শোকার্ত-শোকাতুর চক্ষু হতে তার অজান্তে দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল। দ্বিতলের বাতায়ন হতে লক্ষ্য করল, সত্যিই তার আব্বা আসছে। কাঞ্চনকে বলল, 'যাও তো মা বইগুলো রেখে একটু আগে বাড়িয়ে নিয়ে এস।'

পরিচয়ের পর সলীমুদ্দীন কাঞ্চনের সাথে প্রবেশ করল বিয়াই-জামাতার ঘরে। এর পূর্বে সে কোনদিন এ বাড়ি আসেনি। কাঞ্চন ছোটমায়ের ঘরে নিয়ে গেলে বদরু সালাম জানিয়ে আব্বার মাথা-চুম্বন করে কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর বসতে আসন দিল। তারপর বদরু দেখল তার পিতার দুঃখপীড়িত মুখের প্রতিচ্ছবি। তারই শোকে এটা হয়েছে জেনে তা দূর করার চেষ্টায় পিতার সামনে হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু হায়! হাসি কোথায়? চিরদিন যে কেঁদেই এসেছে, সে হঠাৎ ক'রে কি আর হাসির দেখা পায়? হাসির বদলে চলে এল তার বুকে, মুখে কান্নার ঢেউ। কোন রকমে তা সংবরণ করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল।

কাঞ্চন গিয়ে বলল, 'ছোটমা! শরবত করে দেবে না?'

বদরু বলল, 'যাও তো মা! ও ঘর থেকে চিনি নিয়ে এস।'

কাঞ্চন চিনি আনতে গেলে বাঘিনী পিতামহীর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। বলল, 'চিনি কি করবি?'

কাঞ্চন বলল, 'ছোটমায়ের আব্বা এসেছে, শরবত করব।'

ঝংকার দিয়ে দাদীমা বলে উঠল, 'ছোটমায়ের আব্বা এসেছে তো তোর কি? ছোটমায়ের আব্বা এক বস্তা চিনি কিনে রেখে গিয়েছিল নাকি? একেবারে কামাই ক'রে এল। বল্‌গে যা চিনি নাই!'

সিংহের গর্জন শুনে বনের অন্য জন্তুরা যেমন নীরবে কেঁপে ওঠে, ঠিক বাড়ির সকলে কেঁপে উঠল। রাগে, ক্ষোভে, ঘৃণায় ও লজ্জায় কাঞ্চন নিজের রুমে চলে গেল।

পিতা বুঝে বলল, 'আমি পানি খাব না মা! এই তো আসছি দু'পায়ের রাস্তা।'

চক্ষুর অবারিত অশ্রুধারাকে বারণ করার ক্ষমতা কার আছে? বদরুর দুই গন্ড বেয়ে পানির স্রোত বইতে লাগল। সাথে সাথে পিতারও দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। মনে মনে বলল, পিতার স্বপ্ন মিথ্যা নয়।

ক্ষণকাল পরে ব্যাঘ্রী শাশুড়ী মাতা এসে জেনেও না জানার ভান করে পিতার দিকে ইঙ্গিত করে বদরুর উদ্দেশে বলল, 'ও কে লো--?'

বদরু মুখ নিচু করে বলল, 'আব্বা।'

শাশুড়ী বলল, 'কি করতে এসেছে?'

অচিন্তনীয় প্রশ্ন! অসম্ভাবনীয় কথা! এর উত্তর কে দেবে? কেউ কিছু বলল না। ইতিমধ্যে কান্ড দেখার জন্যেই কাঞ্চনও সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সেই গা-জ্বালা প্রশ্নে উত্তর দিয়ে বলল, 'খেতে পায়নি, তাই তোমার মরার খবর শুনে খেতে এসেছে!'

বোধ হয় পিতামহীর শরীর গরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সে পৌত্রীকে কিছু বলল না। বদরুর পিতা বুঝল, এটাই তার বিয়ান। অতএব সম্মান দিয়ে বলল, 'বিয়ান কেমন আছেন?'

'কেমন আবার থাকব' - বলে মোটা ঠোঁট উল্টিয়ে পিঠ ঘুরিয়ে চলে গেল। যাবার সময় কাঞ্চনের উদ্দেশে বলল, 'দাঁড়া, তোর বাপ আসুক ঘরে।'

সকলেই নিজেকে সর্বাধিক অপমানিত বলে মনে করল। এই শ্রেণীর উপেক্ষণীয় কথা শুনে শাশুড়ীর প্রতি পিতার ঘৃণা জমে গেল। কিছুক্ষণ পরে বদরুকে বলল, 'তোর শাশুড়ীমাকে আর একবার ডাক তো মা! একটু দরকার আছে।

বদরু ডাকতে গেলে শাশুড়ী বলল, 'আমার কাজ আছে। যে ডাকছে তাকে এ ঘরে আসতে বল!'

আর কেউ হলে মনে হয় উঠে পালিয়ে আসত। কিন্তু গরীবের সবই সয়। তাতে আবার মেয়ের বাবা! বরের মায়ের কথায় রাগ করলে সাজে? তার উপর আবার বিনা পণের বিয়ান! আর কথায় বলে যে গাই-এ দুধ দেয়, তার চাট সহ্য হয়। সুতরাং এত অপমানিত হয়েও বদরুর সাথে তার শাশুড়ীর ঘরে গিয়ে হাজির হল।

পিতা বলল, 'বিয়ান! বদরুর মুখে শুনলাম, আপনার ছেলেকে তো বলাই আছে, অনুমতি হলে মেয়েটিকে একবার নিয়ে যেতাম।'

পণলোভী বিয়ান যেন একটা সুযোগ পেল। বলল, 'মেয়ে নিয়ে যেতে হলে, নিয়ে যাও। কিন্তু ফিরার সময় যেন যৌতুক নিয়ে এ ঘর ঢুকে। বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছি পঞ্চাশ হাজার টাকা, আট ভরি সোনা নিয়েছি। বড় বউ সংসারের হিরে থেকে জিরে পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আর তোমার মেয়ের নিজের শোবার বালিশটা পর্যন্ত নাই।'

সলীম বলল, 'আমরা জানি বিয়ান, শুধু হাত মুখে যায় না। আমার যতটা সাধ্যে আছে ততটা দেব বলে তো কথা হয়েছে বিয়াই-এর সাথে। বিয়াই কখন বাড়িতে আসবেন?'

- শুধু কথা হওয়াই যথেষ্ট নয়। কাজে হতে হবে। আগে ফয়সালা হবে, তবে মেয়ে নিয়ে যাবে।

- না, ও রকম বলছেন কেন? 'দেব' বলেছি, তখন দেবই। এখন আমার আব্বার বড় অসুখ। মেয়েটাকে দেখতে চেয়েছে। তাই বলছিলাম, দু'দিনকার মত----।

- না। এখন নিয়ে যেতে হলে একেবারে নিয়ে চলে যাও।

বদরুর পিতা আর কিছু বলার চেষ্টা করল না। তার বক্ষ হতে ওষ্ঠাধর পর্যন্ত কেঁপে উঠল। নিরাশায় চক্ষে অন্ধকার ছেয়ে এল। ভাবল, পিতাকে কি জওয়াব দেবে? বুঝতে পারল, বদরুকে কত দুঃখ, কত জ্বালা, কত কথা, কত গঞ্জনা, কত ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়। অনুভব করল, মোড়ল বিবি ধনলোভী শাশুড়ীর পরের মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কথা। তবুও মনের উপর জোর দিয়ে শেষবারের মত বলল, 'বিয়ান! দয়া করুন। আজকে নিয়ে গিয়ে কালকে দিয়ে যাব। একবার অনুমতি দেন। না হলে আমার বুড়ো বাপটা কেঁদে মারা যাবে।'

বলেই সলীমুদ্দীন হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে ফেলল। তার সাথে বদরুও হুঁ-হুঁ করে কেঁদে উঠল। মনে হয় গরীবের কান্না দেখে সামনের গোয়ালে বড়লোকদের গরুগুলোও কাঁদছিল। গোয়ালের চালে কাকের দলও 'কা-কা' ক'রে দুঃখ প্রকাশ করছিল। সেই কান্নায় সমবেদনা প্রকাশ করে সামনের পেয়ারা গাছ থেকে একটি পেয়ারা খসে পড়ল। কিন্তু দয়া প্রকাশ করল না বদরুর পণলোভী নির্দয়া শাশুড়ী। সেই শুধু একবার 'না' ছাড়া 'হুঁ' বলল না। ওঃ! মানুষের কত বড় লোভ! মানুষ কত বড় স্বার্থপর! এত বড় জমিদার হয়েও কাঙ্গালের ধনে হাত বাড়াতে চায়? 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি!'

নৈরাশাগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়ে পিতা ফিরে এসে বদরুর কামরায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ঝর্‌ঝর্‌ ধারায় তার চক্ষু হতে অশ্রুধারা নির্গত হয়েই যাচ্ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে শিক্ষিত দ্বীনদার জামাই পেয়ে মনে করেছিল, মেয়ে কতই না সুখে পড়েছে। কিন্তু এ যে আশার বিপরীত! বদরু যে এত লাঞ্ছিতা, তা কি জামাই জানে? জামাই এত বড় নিরুপায়, তাই বা বিশ্বাস করা যায় কিভাবে?

বৃদ্ধ পিতা তাকে পাঠিয়েছিল তার আদরিণী পৌত্রীকে দেখতে, তাকে কি বলে বুঝাবে? কি বলে সান্ত্বনা দেবে?

হয়তো পিতা বলবে, তাকে দেখতে হবে না, সে সুখে থাকলেই তার সুখ।

কিন্তু হায় সুখ কোথায়? পিতার মনে কন্যার দুঃখ-কষ্ট যে সপ্ত দোযখ থেকেও বেশী

যন্ত্রণাদায়ক। কন্যার এত দুঃখ স্বচক্ষে দেখে পিতার মন কিরূপে শান্তি পাবে?

পিতা বদরুকে বলল, 'অদৃষ্টের লিখন খন্ডন করার কেউ নেই মা! কাঁদিস্ না। আল্লাহর কাছে দুআ কর। দুআতে তকদীর পাল্টে যায়। আর আমি তোর হতভাগা অসহায় গরীব বাপ। আমি কি করতে পারি বল?'

বদরু আরো জোরে কেঁদে উঠল।

পিতা ভেবে দেখল, এই অবস্থায় যদি তাকে নিয়ে যায়, তবে সে হয়তো জামাতার কাছে খারাপ হয়ে যাবে। শাশুড়ী হাজার উপেক্ষা করলেও স্বামীর কোলে যদি স্থান পায়, অদূর ভবিষ্যতেও যদি সুখ পায়, তাহলে পূর্ব দুঃখ মুহূর্তে ভুলতে পারবে। কিন্তু এ রকম চোখে দেখা আগুনে মেয়েকে ফেলে রেখে চলে যায় কি ক'রে?

বদরু তখনো কাঁদছিল। দাদু তাকে কত ভালোবেসেছে। কোলে-পিঠে নিয়ে মানুষ করেছে। সে আজ অক্ষম। দেখবার ইচ্ছা করেও দেখতে পাবে না। আর বদরুও তাকে একবার দেখা ক'রে সাক্ষাৎ করে আসতে পারবে না। ধিক্ তার নারী জীবনে! ধিক্ তাদের গরীবী হালে!

বদরু একটু প্রকৃতিস্থ হল। পিতাকে বড় বিষণ্ন দেখে শোক-সন্তপ্ত কণ্ঠে বলল, 'আব্বা! এখন কি করবে?'

আব্বা মেয়ের মুখের প্রতি অসহায় দুর্বলের মত তাকিয়ে আবার উচ্চৈঃস্বরে 'হাউমাউ' ক'রে কেঁদে ফেলল। স্থানের খেয়াল আসতে খুব কষ্টে সংবরণ ক'রে নিয়ে কাঁপা গলায় বলল, 'কি আর করব মা? তোর আর আমাদের ভাগ্য!'

কান্নার উপর কান্নার ঢেউ সকলের চোখে-মুখে। পিতা পুনরায় বলল, 'করার কিছু নাই মা! আমি এবার বাড়ি যাই। আর এক দন্ডও আমার এ বাড়িতে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

বদরু বলল, 'আমিও যাব। আমিও আর থাকতে চাই না। চলো, তোমার সাথেই যাব।'

পিতা বলল, 'না মা! গেলে আরো বিপদ বাড়বে। তখন চিরদিনটাই হয়তো কাঁদতে হবে।'

কন্যা বলল, ক্ষতি কি আব্বা! যে ঘরের মানুষের কাছে মানুষের পরিচয় নেই। যে ঘরের মানুষ মানুষকে পশুর মত মনে করে। যে ঘরে মানুষের মনুষত্ববোধটুকুও নেই। যে ঘরে দিবারাত্র আল্লাহর ইবাদত ব্যতিরেকে খেয়াল-খুশীর ইবাদত চলে। সে ঘরে আমারও থেকে লাভ নেই আব্বা! সে ঘরে থাকার চেয়ে বরং নিজের ঘরে খেতে না পেলেও পেটে কাপড় বেঁধে পড়ে থাকা অনেক ভাল।'

পিতা বলল, 'না মা! সংসার না ক'রে কি সুখ আছে রে?'

বদরু পিতার মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল, 'এই সুখ? যে সুখ তুমি চোখে দেখলে, সেই সুখ?'

পিতা বলল, 'না মা! ভুল বুঝিস্ না। তোর স্বামী তো কিছু অন্যায় করে নাই। পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার মত তাকে একবার সুযোগ দে।'

সত্যিই তাই। স্বামী তো নিষ্ঠাবান, ন্যায়পরায়ণ, তবে নিরুপায়। বদরু আর কোন উত্তর করল না। ভাবল, তাকে সুযোগ দেওয়া সত্যই দরকার। বুঝল, সে বড় অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছিল। শাশুড়ীর প্রলাপে সে স্বামীর মনে আঘাত দিতে যাচ্ছিল। যে তার জন্য লড়ে যাচ্ছে, সে তাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছিল। এ নির্ঘাত অন্যায় বুঝে বদরু পুতুলটির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পিতা ঝেড়ে উঠে পড়ল। বলল, 'মা! তবে থাক্। তোর হিফাযতের ভার আল্লাহকে ভেরে দিলাম। আল্লাহ তোকে রক্ষা করুক। তোর দুঃখ-কষ্ট দূর করুক। অবশ্যই সবরে মেওয়া ফলে। কষ্টের পর স্বস্তি আছে। আকাশের মেঘ কেটে সূর্যের হাসি আসবে। শীতের বরফে চাপা পড়ার পর আবার গাছে কিশলয় আসবে, ফুল ফুটবে। বসন্তের কোকিল ডাকবে মা তোর সংসার জীবনে। যেখানেই গভীর রাত, সেখানেই আসে সুপ্রভাত। অন্ধকার দেখে নিরাশ হোস্ না, ঢেউ দেখে লা' ডুবিয়ে দিস্ না মা!'

জ্ঞানী মেয়ে জ্ঞানের কথা শুনে ক্ষান্ত হল। মনের ভিতরে নতুন করে বল ফিরে পেল। কিন্তু বড় নাচারের মত বলল, 'তুমি চলে যাবে আব্বা! কিছু খাওয়া হলো না!'

পিতা যেতে যেতে বলল, 'দরকার নাই মা! তোর শাশুড়ী যা খাইয়েছে, তাই হজম হতে অনেক দেরী লাগবে রে!'

বদরু শেষবারের মত বলল, 'দাদুকে সালাম দিও আর আমার জন্য দুআ করতে বলো।'

'বেশ, যাই। আস্-সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহ।' বলে পিতা বিদায় নিয়ে চলে গেল। দু'তলার উপর থেকে যদ্দূর নজর যায়, তদ্দূর তাকিয়ে পিতার বিদায়-যাত্রা দেখল। ভাবল, হায়রে! আবার কখন পিতৃদর্শন সুখ লাভ হবে? নারীর কাছেও কি নারী এত অবলা?

রুমে ফিরে এসে বদরু বিছানার উপর মুখ গুঁজে রোদন করছিল। শাশুড়ী এসে বলল, 'কি লো! বাপের শোকে ভাতও খাবি না দেখছি।'

ততক্ষণে কাঞ্চনও এসে হাজির হল। তার করার কিছুই ছিল না। কিন্তু এ সব দেখে সে কঠোর হয়ে উঠছিল। মা ও দাদির পিতপিতিনি দেখে ঘৃণাভরে অভিজ্ঞতা অর্জন করছিল। দাদির কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ছোটমা এখনো ভাত খায়নি বুঝি?'

- কি ক'রে খাবে? বাপের ঘর যাবার জন্যে নেচে বেড়াচ্ছিল। আবার যেতে না পাওয়ার

শোক।

- বুঝেছি, সারাদিন খাটিয়ে আসরের সময় ভাত দাও। আচ্ছা বল তো, ছোটমায়ের কেন এমন অবস্থা?
- তোর শুনে লাভ কি?
- আমরাও তো বিয়ে হবে। শ্বশুরবাড়ি যাব। যদি তাই হয়। তোমার মত শাশুড়ী হয়।
- তোর অনেক টাকা দিয়ে বিয়ে দেব। বসে খেতে পাবি।
- ও, তার মানে পণ পাওনি বলে ছোটমায়ের এমন দুরবস্থা করতে চাও।
- ঠিকই তো। আমরা এ বিয়েতে রাজিই ছিলাম না। নূরো যখন আমাদেরকে রাজি হতে বাধ্য করেছে, জোর করে বউকে ঘরে বসিয়েছে, তখন ওকেও আমাদেরকে রাজি ক'রে চলতে হবে। আমাদের মতে না গেলে কোন সুখ পাবে না ঘরে।
- কিন্তু ছোট আব্বাকে কি বলবে? সে তো সব জানতে পারবে, তখন?
- তাকে যদি লাগায়, তাহলে জয় কার তখন দেখে নিবি।

পরের সপ্তাহে বাড়ি ফিরে মাষ্টার জানতে পারল, বদরুর বাপের বাড়ি যাওয়া হয়নি। কারণ জানার চেষ্টা করলেও বদরু সব কিছু চাপা দিয়ে ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক বানিয়ে নিল। দু'দিনকার জন্য বাড়ি এসেছে, তাকে আবার বাড়ির ঘটনাঘটনের সাথে জড়িয়ে তিক্ত করবে? তবুও মাষ্টারের বুঝতে অবশিষ্ট থাকল না যে, মায়ের কারণেই সে যেতে পারেনি। কিন্তু বিনা দাবী ও দলীল-সাক্ষীতে সে মায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলল না। স্ত্রীর গুণ বুঝে শুধু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ধৈর্য ধর প্রিয়তমে! যদি সুখ চাও। ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ থাকেন।' তারপর পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরে বলল,

'ভয় করো না বদরু সোনা ভয়কে কর জয়,
আল্লাহ যাদের সাথের সাথী নেইকো তাদের ভয়।'

তারপর প্রেম-বিহারে বিভোর হয়ে রাত্রির অন্ধকারে চাপা দিল সকল দুঃখ-ব্যথাকে।

আদর্শ নারী তুমি বদরু! তুমি রমীসার মত নও, তবুও তার অনেক কাছাকাছি। সন্তান-হারানোর শোক চাপা ও গোপন রেখে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে না পারলেও, নিজের হৃদয় হারানোর শোক চাপা রেখে, এত আঘাত সহ্য করে সেসব কথা স্বামীর কানে না দিয়ে স্বামীকে আনন্দ দিতে পার?

জানি বদরু তুমি সেই নারী, যে জানে, স্বামীকে সিজদা করা যায় না, কিন্তু সে সিজদার যোগ্য।

তুমি সেই স্ত্রী, যে অধিক প্রণয়িনী, ভুল করে স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, 'আপনি রাজি (ঠান্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না।'

সেই শ্রেষ্ঠা রমণী তুমি, যার প্রতি স্বামী দৃক্‌পাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।

তোমার মত স্ত্রী পেয়ে মাষ্টারের গর্ব হওয়ারই কথা। কে না চায় তোমার মত স্ত্রী? কয়জনের ভাগ্যে জোটে এমন সহধর্মিণী? আর তোমার মত মেয়ে আছেই বা কয়জন?

পুরুষ সংসারে অনেক সময় গত্যন্তরহীন হয়। পাঁচজনের মন মানিয়ে চলতে হিম্‌সিম খেতে হয়। সংসার ছেড়ে যেতেও অনেক ভাবনা ভাবতে হয়। সেই রকমই কোন ব্যাখ্যা খুঁজে স্বামীকে মেনে নিতে হয়। আর ভুল বুঝলেই ঠকতে হয়।

মাষ্টার যে বদরুর ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিল তা নয়। তবে সে কুলের কথা খুলে জানত না। চাকুরি ছাড়া তার নামে লিখিত কোন জমি-জায়গা ছিল না। তাছাড়া মা-বাপের মতের তোয়াক্কা না করেই সে বদরুকে স্ত্রী বলে বরণ করে এনেছে। বাড়ির কেউ হয়তো এখনো তা মেনে নিতে পারেনি। পরন্তু পিতামাতার বিরুদ্ধে ঝগড়া করার মানেই মান-সম্মান হারাবে। কারণ না বুঝে লোকে ছেলেরই দোষ দেবে। সুতরাং বৃথা ঝগড়া বাড়িয়ে কোন স্বার্থ নেই। তার চেয়ে চুপ থেকে সবর করা ভাল। সবর তিক্ত হলেও, তার ফল বড় মিঠা।

তাই যাবার আগে সে বদরুকে কেবল উপদেশ দিয়ে গেল যে, কোন বিষয়ে দুঃখ-দুশ্চিন্তা না ক'রে যদ্দূর সম্ভব মায়ের সন্তুষ্টি লাভ কর। এমনভাবে কাজকর্ম করবে, যাতে মা কোন রকমের ত্রুটি বিলক্ষণ করতে না পারে।

কিন্তু কোথায়? সাপের পূজা করলে কি সাপ ছোবল হানা বন্ধ করবে? আগুনের কত পূজা দেওয়া হচ্ছে, তবুও আগুন সন্তুষ্ট হয়ে একবার বলছে না যে, সে আর তার দহন-ক্রিয়ায় পূজারিণীকে দগ্ধীভূত করবে না। সে পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে শীতল হবে। বরং একই ধারায় অহরহ চলতে থাকে বদরুর উপর গঞ্জনা-ভর্ৎসনা। কখনো হত্যার পরিকল্পনা চলে। কখনো আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া হয়।

কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ! সেই বুঝে বদরু সে কল্পনায় যায় না। তাছাড়া স্বামী তার সহায়। আর যে জাহান্নামের কঠোর শাস্তিকে ভয় করে সে আত্মহত্যা না করে দুনিয়ার হাল্কা শাস্তি সহ্য করে নেয়।

এইভাবে স্বামী আসে-যায়। গুণবতী সবকিছু গোপন করে। সব জ্বালা সহ্য করে। স্বামীর কাছে কিছুও প্রকাশ করে না। বিনা পণের বউ গরীবের মেয়েকে আরো কত সইতে হয়।

ভাতে পেট না ভরলে বাড়তি ভাত চাইতে পারে না, কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। ভালো তরকারি খেতে পায় না। মাথায় তেল পায় না। একটু সাজ-গোজ করতে পারে

না। নিজের আত্মীয়ের খাতির করতে পারে না। 'বিনা পণের বউ' শ্বশুর বাড়িতে কোন পজিশন পায় না।

কাপড় ছিঁড়লে বলে, পাছায় ফাল আছে নাকি?

বাটি ভাঙলে বলে, হাতের আঁট নাই, কচি খুকী! আনতে নাই, ভাঙতে আছে।

হাসলে বলে, বেশ্যার মত হাসি কেন?

কাঁদলে বলে, যেন বাবা মরেছে!

অসুখ হলে বলে, জারে বউ জার-কাতুরে বর্ষায় বউয়ের হাজা, কখনো দেখলাম না আমি রইল বউটি তাজা।

অসুস্থ হলে সুচিকিৎসা পায় না।

স্বামীর সাথে হাসি-মজাক করলে বলে, ছিঃ ছিঃ! ঢেটি মাগী। কথায় বলে, দিনে ভাশুর, রাতে পুরুষ।

স্বামীর আহবানে একটু আগে শুতে গেলে বলে, সাঁজবেলাতেই শুতে গেল!

উঠতে দেরী হলে বলে, লায়লা-মজনুর মত এখনো শুয়ে আছে!

আগালেও দোষ, পিছালেও দোষ, দেখতে নারি চলন বাঁকা।

'বিনা পণের বউ' আরো কত কষ্ট পায় মহিলা মহলে। সেসব কথা বদরুর মত জ্ঞানী মেয়েরা না মা-বাপের কাছে বলে, আর না স্বামীর কাছে। বিশেষ ক'রে যখন এ কথা সুনিশ্চিত যে, সেসব কথা বলে মন হাল্কা করা ছাড়া লাভ তো কিছু হবে না, বরং মনের সাথে মনের দ্বন্দ্ব বাধবে, নিজের পজিশন নষ্ট হবে। স্বামী এবং নিজেরও বদনাম হবে। আর দুশমন খোশ হবে ও হাসবে।

(২০)

যেদিন পুত্রের মুখে বৃদ্ধ শুনল যে, তার বদরু বড় দুঃখে বাস করছে এবং তাকে তার শাশুড়ী আসতে দেয়নি, সেদিন হতে তার অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। এক সপ্তাহ কাটার পর সলীমুদ্দীন কি যে করবে, কোন কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারল না। কোথায় কেমন ক'রে দু' মুঠো অন্ন-ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হবে, মেহনতের পর রান্না ক'রে পিতার পরিচর্যা কিরূপে করতে পারবে, কোথায় কিভাবে অর্থ জোগাড় করে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাকে সুস্থ করে তুলবে - এ সব চিন্তার সিন্ধুতে যেন সে ভেসে বেড়াচ্ছিল। গ্রামের ছোট-বড় পাঁচ রকম লোকে বলছে, ভালো ডাক্তার এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে তার রোগ সেরে যাবে। কিন্তু ডাক্তার এনে দেখানোর সামর্থ্য কোথায়? সে অর্থ কোথায়?

মোড়লের পরামর্শে একজনের কাছে পাঁচ কাঠা জমি বন্ধক রেখে পাঁচশ' টাকা ঋণ নিয়ে এসে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাল। ডাক্তারবাবু আশা দিলেন, টাকা নিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যা বেলায় বৃদ্ধ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ছেলেকে বলল, 'বাবা! টাকা খরচ ক'রে লাভ নেই রে! আমার বদরুকে একবার দেখা। আমি আর বাঁচতে চাই না।'

পুত্রের বক্ষ ছেদ করে অন্তর ভেদ করে একটি 'আঃ' শব্দ বের হয়ে এল। মনে মনে বলল, বদরু আসার নয়। বদরু আর আসবে না। সুখেও না। এ দুখের দিনেও তার আগমন ঘটবে না। আসবে কি ক'রে? আমরা যে কপর্দকশূন্য গরীব। আমরা তার বিনা পয়সায় বিয়ে দিয়েছি। তাকেই তো আমরা পণস্বরূপ দিয়ে তারই বিয়ে দিয়েছি! তবে দেওয়া জিনিস আবার ফিরে আসবে কিভাবে? কেমন ক'রে আসবে? কোন্ পথে আসবে? এ সমাজের মানুষের আচরণ-বিচরণের পথ বড় দুর্গম, কন্টকাকীর্ণ। সে পথে আসা বড় সুকঠিন। শূন্যপদ গরীবের এ পথে আসা কোন মতেই সম্ভব নয়। গরীব কোনমতেই সমাজের কুপ্রথার পুলসিরাত অতিক্রম ক'রে সুখ-বেহেশ্তে পৌঁছতে পারবে না। সমাজের অর্থলোভী বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তিলাভ করতে পারবে না। পারবে কেবল সেই, যার আছে টাকা; গাড়ি গাড়ি টাকা, তোড়া তোড়া টাকা, ছড়া ছড়া টাকা। পারবে বেঈমান, অসাধু ব্যবসায়ী, পারবে চোর যার চৌষট্টি বুদ্ধি, পারবে যালেম অত্যাচারী, পারবে সুদখোর স্বৈরাচারী।

পিতাকে বলল, 'আব্বা! যতক্ষণ আমার জীবনটুকু আছে, ততক্ষণ তোমার জীবনকেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি। নচেৎ আমি একলা থাকব কি ক'রে? আর বদরুর কথা ভুলে যাও। সে আমাদের কেউ নয়। বদরু আমাদের পর হয়েছে। আমাদের বদরু আর আমাদের নয়, সে এখন পরের হাতে পণবন্দিনী।'

পিতা শুষ্কাশ্রুভরা নেত্রে পুত্রের প্রতি দৃক্পাত ক'রে বলল, 'না বাবা! আমাকে বাঁচিয়ে আর কাজ কি? আমাকে নিয়ে তোর দুঃখ যে আরো বেড়ে উঠবে রে!'

পুত্র কোন কথা না শুনে পুনরায় আরো পাঁচ কাঠা জমি বন্ধক রেখে আরো পাঁচশ' টাকা নিয়ে এল। বিনা স্বার্থে তো আর কেউ ঋণ দেয় না। হয় বেশী টাকার সূদ, না হয় জমি বন্ধক দিয়ে তার ফসলের সূদের বিনিময়ে ঋণ ছাড়া উপায় কি গরীবের? কে দেবে তাকে টাকা? কি দিয়ে পরিশোধ করবে সে টাকা? আর এই রীতিতেই যে বড় সে বড় হতেই থাকে। আর যে একবার নেমে যায় তাকে অধঃপতনের অতল তলে নেমে যেতেই থাকে। পরিশেষে গরীব আরো গরীব হয়, নিঃস্ব হয়, ভিখারী হয়।

ঋণ করা টাকা নিয়ে ডাক্তার চিকিৎসা ক'রে যায়। মন মানে না টাকা খরচ করে, কিন্তু যার বয়স হয়েছে, তাকে চিকিৎসা কি নতুন জীবন দান করতে পারে? চিকিৎসা কি বিধির বিধান খন্ডন করতে পারে? সব টাকাই নিঃশেষ হল, কিন্তু পিতা সেরে উঠল না। বরং

দিনের দিন আরো রুক্ষ-রুগ্ণ হয়ে যেতে লাগল।

সেদিন হঠাৎ ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, ‘বৃদ্ধ আর বেশিদিন বাঁচবে না।’

পুত্র যেন আকাশ হতে পড়ে গেল। এত কিছু করেও পিতাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে না জেনে মস্তকে করাঘাত করতে করতে মাটিতে বসে পড়ল। মস্তক যেন চাকির মত ঘুরতে লাগল। তার সাথে পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়ি, গাছপালাও যেন ঘুরছিল। আর সেই ঘুরপাকে যেন মনে হল, তাদের স্নেহের বদরু ছুটে ছুটে আসছে। তাকে মনে করতেই চমকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পুনরায় মাটিতে পড়ে গেল। আর তার পরেই সে বেহুঁশ হয়ে গেল! পাড়ার মেয়েরা তার জ্ঞান ফিরাল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় দিবাকর বিদায় নিল নীলিমা গগন হতে। পক্ষীকুল যখন মাঠ ও বাগান থেকে ফিরে আসছিল নিজ নিজ কুলায়, ঠিক সেই মুহূর্তে পিতার জীবন পৃথিবীর মায়াজাল হতে চিরতরের জন্য বিদায় নিতে চাইল। পুত্র অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে পিতার পদতলে বসে চিন্তা করছিল বদরুর কথা। এই অন্তিম সময়ে যদি পিতা তার মুখখানা দেখতে পেত, তাহলে হয়তো তার মরণ সুখের হত। অতএব এই ভেবে সাইকেলে কালোকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বদরুর কাছে। অতঃপর সলীমুদ্দীন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সদর দরজার দিকে। গ্রামের কত ছেলে কত মেয়ে আসে-যায়, তাদের চেহারার মাঝে বদরুর চেহারা খোঁজে। ওর মত শাড়ি পরা কোন মেয়ে প্রবেশ করলেই মনে হয়, বদরু প্রবেশ করছে। আর তখনই সে চমকে উঠছে। যেন সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। কল্পনায় হারিয়ে ফেলে নিজেকে। বদরু কি আসবে? তার শাশুড়ী কি আসতে দেবে? বাহির হতে যে আসে তাকেই জিজ্ঞাসা করে, তার বদরু আসছে কি না? সকলেই বলে, না, বদরু আসেনি।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে কালো ফিরে এসে সংবাদ দিল, তার শাশুড়ী কোন মতেই আসতে দিল না। বদরু কেঁদে বসন ভিজিয়ে দিল, কিন্তু তার পিতামহকে জীবনের শেষ সাক্ষাৎ করার মত অবকাশটুকু আর দিল না মুসাম্মাৎ যালেমা বিবি শাশুড়ী। বরং ‘এ রাতে কি ক’রে যাবে, কার সাথে যাবে’ ইত্যাদি ওযরের সাথে হেন-তেন সাত-সতের কথা শুনিয়ে তার কলিজা ছেঁদা করে দিল।

পিতা সংবাদ শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পুত্র তার পদতলে লুটিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর পিতার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। পুত্রকে সস্নেহে বলল, ‘বাবা! আর আমার সময় নাই। আর পারছি না রে! বদরুকে আমার ভালো ক’রে দেখিস। সে যেন কোন প্রকারের কষ্ট না পায়। মা বদরু আমার কত যত্ন করেছে। তোমাকে শেষবারের মত আর দেখতে পেলাম না। আমার মরার আগে তোমার বিয়ে দিয়ে কবরে ভরে দিলাম তোমাকে। আল্লাহ তুমি এর বিচার করো। এ বঞ্চিত গরীবের অধিকার তুমি ফিরিয়ে দিও। আমার বদরুকে সুখ-শান্তি

দিও। উঃ! পানি---। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!’

তারপর পিতার বাক্‌রুদ্ধ হল। পুত্র কেঁদে কেঁদে পিতার মুখে পানি দিল। উপস্থিত সকলেই ‘হায়-হায়’ করে উঠল। কেউ বৃদ্ধের প্রশংসা করতে লাগল, কেউ বদরুর। কেউ গালি দিতে লাগল বদরুর ধনলোভী শ্বশুর-শাশুড়ীকে, কেউ দিল অভিশাপ। কেউ জামাইকে ধিক্কার দিতে লাগল। কেউ বলল, ভালো হলেও সে ভীরু কাপুরুষ, শিক্ষিত হলেও সে দায়িত্ববোধহীন। কেউ বলল, আসলে এদের ভাগ্যই মন্দ।

তারপর? তারপর সব শেষ। পিতার জীবনের শেষ আলোটুকু কোথা, কোন পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হয়ে গেল। প্রাণপাখীর খাঁচা পড়ে রইল ধূলির ধরাতে। আর সোনার পাখী খাঁচা ছেড়ে উড়ে গেল কোন্ বনে। আর একবার সে পাখী ডাকল না। আর একবার সে কোকিল ‘কুহু’ বলল না। আর একটিবারও ‘বদরু’ বলে ডাকল না। চলে গেল মায়ার এ সংসার ছেড়ে, বিদায় নিল এ পাপের দুনিয়া হতে, চলে গেল আর ফেলে গেল একা পুত্রকে, ভুলে গেল সব মায়া! ভুলে গেল বদরুকে, ভুলে গেল আদরের পৌত্রীকে। যে ভেবেছিল তার বিবাহের জন্য, সে একবার তার সুখের জন্য ভেবে গেল না।

গ্রামের লোকের সহযোগিতায় রাত্রি মধ্যে তার দাফন-কাজ শেষ হল। বিয়াই এসেছিল লজ্জার খাতিরে। অবশ্য সলীমুদ্দীন তার সাথে কথা বলেনি।

রবিবার বদরু সহ মাষ্টার দেখা করতে এল পিতাকে। তাকে জড়িয়ে ধরে বড় কাঁদল বদরু। বড় আফশোস করল মাষ্টার। পাড়ার মেয়েরা শত কথা বললে ক্ষমা চাইল সে। আর করারই বা আছে কি? যা ঘটার তা ঘটেই গেছে।

বদরুকে ছেড়ে মাষ্টার সোজা স্কুলে গেল। এক সপ্তাহ বদরু পিতার খিদমত করল। কিন্তু সে অনুভব করল, আব্বা আর সেই আব্বা নেই। পরিশেষে তাকেও ছেড়ে যেতে হল, ফিরে যেতে হল তার নিজ কবরে।

সলীমুদ্দীন কি আর করবে। পিতা সেও ছেড়ে চলে গেল। বদরুও একা ফেলে বিদায় নিল। সে নিজের জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগল। পাগলপারা হয়ে যত্রতত্র ভ্রমণ করতে লাগল। কোথাও পেলে খায়, না পেলে এমনিই ভুখাফাকা পড়ে থাকে। দিন যত অতিবাহিত হতে লাগল, সলীমুদ্দীনের পিতা-কন্যাহারা শোকজনিত পাগলামি তত বর্ধমান হতে লাগল। এ পরিস্থিতি দেখে তার উত্তমর্ণ ভাবল, তার হাজার টাকা হয়তো পানিতেই যাবে। কাল বিলম্ব না করে সে বাড়িতে এসে সলীমুদ্দীনকে বলল, ‘তোমার তো টাকা পরিশোধ করার কোন ক্ষমতাই নেই। তাহলে কি করবে?’

সলীম বলল, ‘টাকা কিসের?’

উত্তমর্ণ বুঝল, বিপদ। বলল, ‘সেই বাপের অসুখে জমি বন্ধক রেখে টাকা নিলে।’

সলিমের সংজ্ঞা ফিরল, তাইতো। কিন্তু টাকা সে কোথায় পাবে?

উত্তমর্ণ বলল, 'তাহলে ঐ জমিদুটি আমাকে লিখে দাও।'

হাজার টাকায় দশকাঠা জমি! সলীমুদ্দীন যেন হতভম্ব হয়ে পড়ল। বলল, 'জমি দামদর করে তুমি কিনে নাও। বাকী টাকা দিয়ে জমি রেজিষ্ট্রী করে নাও।'

উত্তমর্ণ অতিরিক্ত এক টাকাও দিতে রাজি হল না। সলীমুদ্দীন বলল, জমি অন্য কাউকে বিক্রি ক'রে তোমার টাকা শোধ করব। কিন্তু বন্ধকের জমি সে ছাড়তে রাজি হলো না, কেউ কিনতেও চাইল না।

পরিশেষে সে জমি রেজিষ্ট্রী করে দিতে বাধ্য হল।

(২১)

বদরু গর্ভ আছে, তবুও কাজ হাল্কা হয় না। পেটে বাচ্চা নিয়েই তাকে যাবতীয় কাজ করতে হয়। ভারী থেকে হাল্কা পর্যন্ত সব কাজই তাকে একা সামাল দিতে হয়। কোন কোন সময় লুকিয়ে কাঞ্চন তার সহযোগিতা করে। অবশ্য পরের সপ্তাহে মাষ্টারের বলাতে ভারী কাজ আর করতে হয় না। হাঁড়ি তোলা, পানি তোলা ইত্যাদি বড় বউ করে, কিন্তু কত কথা শুনিয়ে, কত টিপ্পনী কেটে, কত ব্যঙ্গ ক'রে।

গ্রামের মেয়েদের কাছে বদরু ইতিমধ্যে বেশ পরিচিতা হয়েছে। কুরআন শিখার জন্য অনেক মেয়ে তার কাছে আসে। শাশুড়ী শুরুর দিকে মানা করলেও মাষ্টারের কথামত তা চলতে থাকে। বদরুর নাম হয়, গা জ্বলে শাশুড়ী-বউ-এর।

মহিলা মজলিসে কত রকম কথা চলে। কত লোকের গীবত হয়। ও পাড়ার এক মাষ্টারের ছেলের বিয়ে ছিল আজ। বউ এসেছে ট্যাক্সিতে, যৌতুক এসেছে ট্রাকে! মেয়েরা তা দেখে এসে সন্ধ্যাবেলায় কত রকমের মন্তব্য।

- ভাগ্য বটে, নিজে মাষ্টার নয়। মাষ্টারের ছেলে, সে বিয়েতে কত কি পেয়েছে!

- খাট-পালঙ্গ কি সুন্দর! বিছানা দিয়েছে চার রকমের!

- বউ-এর গা অলঙ্কারে ভর্তি! বরের মা গিয়েছিল বিয়েতে, সেও কত সুন্দর শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ পেয়েছে!

এবারে বদরুর শাশুড়ী বলল, 'আর আমার এক কপাল! চাকরি-ওয়ালা মাষ্টার ছেলে হয়েও একটা কানা-কড়িও পেল না।'

- কিন্তু তুমি বউ-এর মত বউ পেয়েছ বোন!

- ছাই বউ! ওদের বউ কি কম নাকি? আমার বড় বউ কি কম নাকি? বউ পেয়েছি, মনোমতো যৌতুকও পেয়েছি।

- না বোন! ইনসাফের কথা বললে বলতে হবে, তোমার ছোট বউ-এর মত এমন বউ

মেলা মুশকিল আছে।

- দূর ছাই! তোদের আবার কথা, তোদের আবার চোখ।

- তোমার ছেলে ঈমানদারী কাজ করেছে। পরকালে ভালো হবে।

- এই কালই ভালো যায় না আবার পরকালে ভালো হবে?

বদরু জানত ঢেসনা তার ঘাড়ে এসে পড়বে। এটা যেমন স্বাভাবিক ছিল, তেমনি স্বাভাবিক ছিল তার ধৈর্য ধরা, সহ্য করা। এটা ছিল তার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। মানুষ অল্প দুখে কাতর হয়, কিন্তু সে অতি দুখে পাথর হয়ে গেছে। নির্যাতনের পাষাণের মোকাবিলায় ধৈর্যের পাষাণ না হলে এ সংসারে টিকে থাকা বড় মুশকিল তার মত মানুষদের।

গত কয়েকদিন আগে শামসুল এসেছিল দেখা করতে। তার কারণেও তাকে কত কথা শুনতে হয়েছে। সে নিকটাত্মীয় কেউ নয়। তবুও সে আসবে কেন? নিশ্চয় বিয়ের আগে কোন সম্পর্ক ছিল ইত্যাদি।

সত্যপক্ষেই এখন শামসুল তার দাম্পত্য জীবনের জন্য বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু তার স্ত্রীর সাথে তেমন বনিবনাও নেই। স্ত্রী তাকে মানে না, ব্যথা দেয়। ফলে সে বদরুকে মনে করে। আর সেই পুরনো স্মৃতি জাগরিত করেই সেদিন সে দেখা করতে আসে।

যদিও বদরু তেমন পাত্তা দেয়নি। কিন্তু তবুও আত্মীয়তা ও ভদ্রতার খাতিরে তার সাথে দেখা করতে ও কথা বলতে হয়েছে। বাড়িতে পর্দা নেই বলে, যে কেউ সেখানে বিনা বাধায় ও বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে।

ওদিকে সে মাষ্টারের সাথে পরিচয় ক'রে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। যার ফলে প্রত্যেক সপ্তাহে মাষ্টার বাড়িতে এলে সেও মোটর সাইকেল নিয়ে দেখা করতে আসে। আর সেই সুযোগে বদরুর সাথেও দেখা-সাক্ষাৎ হতে কোন বাধা থাকে না। কখনো কখনো তার জন্য উপহারও নিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে সে শামসুলকে এখানে আসতে মানাও করেছে। কিন্তু প্রেমের এমনই আকর্ষণ যে, সে মানা তার কাছে কোন গুরুত্ব পায়নি। সে বলেছে, 'তোমার স্বামী নিষেধ না করলে আমি আসতে থাকব। তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ কেন?'

এইভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। যথা সময়ে বদরুর কন্যা-সন্তান জন্ম নেয়। পণ প্রথার বাজারে আজকাল মেয়েরাও মেয়ে পছন্দ করে না। তাতে আবার মেয়ে হয়েছে 'বিনা পণের বউ'-এর। সে মেয়ে তো আরো অবাঞ্ছিতা। ঐ মেয়ে যেন বদরুর গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া হয়ে দেখা দিল। শ্বশুর-ভাশুর সবাই যেন তাকে ছিনঘিন করতে লাগল।

যদিও স্বামী ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল, তবুও যেহেতু সে বাড়িতে থাকে না, সেহেতু প্রসূতি

ও সদ্যোজাত শিশুকন্যার প্রতি তেমন যত্ন নিতে পারেনি। ভরসা ছিল মা যালেমা বিবির উপর। এ যেন সেই বিড়ালকে মাছ বাছতে দেওয়ার মতই কান্ড হল।

মেয়েকে কেন্দ্র করে বদরুকে অতিরিক্ত কত কথা শুনতে হল। মেয়ে মায়ের বুকের দুধ পেল না। তার জন্য কোন শিশুদুধ কেনাও হল না। অবহেলা ও হতযত্নে মাষ্টার পুনরায় বাড়ি আসার আগেই তার মেয়ে বদরুর কোল ছেড়ে বিদায় নিল। সকলেই ভাবল এ ছিল নিয়তির বিধান। কিন্তু বদরু বুঝল, তা ছিল পরিকল্পিত শিশুকন্যা হত্যা। অবশ্য সে এ ব্যাপারে কারো বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করেনি।

এতে যেন সকলের লাভ হল। মা শিশুহারা শোকের মাঝেও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। যেহেতু সেই মেয়ে নিয়ে তাকে আর কথা শুনতে হবে না। কিন্তু শাশুড়ী-জায়ের মত ছিল ভিন্ন। বদরুই নাকি কথার ভয়ে মেয়ের যত্ন না ক'রে তাকে মেরে ফেলেছে! উল্টা চোর মশান গাইল। অবশ্য সে কথার প্রতি তেমন কেউ কর্ণপাত করেনি।

এইভাবে উত্থান-পতনের সাথে বদরুর জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। গরীব পিতা তাকে আর দেখতে আসে না। মাষ্টারই বরং তাকে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করিয়ে নিয়ে আসে। তরঙ্গায়িত সিন্ধুর মাঝে বদরুর জীবন-তরী নানা ঝড়-তুফানের মাঝে অগ্রসর হতে লাগল। বদরু শত কষ্টের মাঝে তার হাল ধরে থাকল। কি জানি কোন সময় অন্ধকার এলে এই তুফানের সাথে হয়তো পথ ভুল হবে অথবা উত্তাল তরঙ্গের মাঝে তলিয়ে গিয়ে তার জীবন-লীলার অবসান ঘটবে।

(২২)

রাত্রির বেলায় মোড়ল বিবি স্বামীকে বলল, 'তুমি বড় অকেজো লোক। তাছাড়া ছুঁড়ির বাপটা কি সব দেবে বলেছিল তা সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে আসতে।'

স্বামী বলল, 'মেয়েটিকে দেখে আমার খুব মায়া লাগে। দেখতে-শুনতেও ভালো। আমার দিকে তাকালেই আমার মনটা যেন জয় ক'রে ফেলে। মেয়েটির রান্না খেয়েও তারীফ করতে হয়। আচ্ছা! তোমাকে একটু মায়া লাগে না ওকে খাটাতে?'

স্ত্রী হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল, বলল, 'বাবুর এবার মতিচ্ছন্ন ধরেছে। বউ-এর রূপ বাবুর চোখে ধরেছে! বলি, একটু লজ্জা করা উচিত।'

স্বামী হেসে বলল, 'আ-ঃ! তুমি ভুল বুঝছ কেন? আমি কি সে রকম কিছু বলছি নাকি? আচ্ছা তুমিই বল না, ও দেখতে কেমন?'

স্ত্রী স্বামীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে শয়ন করে বলল, 'ছাই দেখতে। বেটা ছেলেদের চোখ।'

- তুমি ভুল বললে।

- আমি যা বললাম সে কথা কানে গেল কি? জমি না কি দেবে বলেছিল, তাড়াতাড়ি লেখাপড়া করে নাও। বুড়োটা মরে গেছে। এখন সেও সবকিছু বিক্রি করে খেয়ে শেষকালে তোমাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাবে, তা জানো?

- আমাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাবে এমন কে আছে? কিন্তু শুনেছ, পণ-প্রথার বিরুদ্ধে দেশে আইন হয়েছে? পণ নিলে জেলে যেতে হবে! পণের জন্য বউ জ্বালালে বধূ-নির্যাতন কেস হবে!

- ছাই আইন। কোন্ আইন আর কে মানছে। সবাই তো পণ নিচ্ছে। সবাই জেলে গেলে আমরাও যাব। আর আমরা নির্যাতন কি করেছি? নির্যাতন করলে আছে কি ক'রে?

- বেশ! এখন ঘুমাও তো। কাল যাই হোক ব্যবস্থা করা হবে।

গতরাত্রের পরামর্শ অনুযায়ী সকাল সকাল বাবু মুহুরি সহ হাজির হল সলীমুদ্দীনের বাড়ি। সে তখন মাঠ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। হঠাৎ বিয়াই এলে তার আগমনুদ্দেশ্য আর বুঝতে বাকী রইল না। উত্তপ্ত লৌহপাত্রে পানি পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমনি সলীমুদ্দীনের উৎপীড়িত হৃদয় বিয়াইকে দেখে 'ছ্যাঁক' ক'রে উঠল! এবার সে বিপদ গণল। ভাবল, এবার সে একান্তই নিঃস্ব হবে।

তা সত্ত্বেও মুচকি হেসে বিয়াইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করল। বিয়াই অন্য কথায় না গিয়ে সরাসরি আসল কথা খুলে বলল।

সলীম বলল, 'দেখুন, এখন যদি আমি আপনাকে রেজিষ্ট্রী ক'রে দিই, তাহলে আপনি কি আমাকে এ বাড়িতে থাকতে দেবেন?'

বাবু বলল, 'থাকবে। কিন্তু আমার দরকার পড়লে তো আর থাকা চলবে না। তবে জমির ফসল এক ছটাকও পাবে না তা বলে দিচ্ছি।'

সলীমুদ্দীন মনে মনে বলল, 'সর্বনাশ! জমি তো নেই। তবে?' ক্ষণেক ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'বিয়াই! আপনি জানেন, আমার আব্বার বড় অসুখ করেছিল। ডাক্তার দেখাতে আর ওষুধ কিনতে অনেক টাকার দরকার ছিল। বন্ধক দিয়েছিলাম কিন্তু টাকা শোধ করতে না পারলে, সে দখল না ছেড়ে রেজিষ্ট্রী করে নিয়েছে!'

বুঝা গেল বাবু ভিতরে ফুলে উঠছিল বিষধর সাপের মত। ফোঁস করে বলে উঠল, 'কথা দিয়ে সে জমি বিক্রি করলে কেন?'

- আমি বিক্রি করতে চাইনি বিয়াই! বিশ্বাস করুন। সরল মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে এই কান্ড হয়ে গেছে।

- তুমি সরল! তুমি তো চালাক হে! বিক্রি করে ফিক্স্ড ডিপোজিট ক'রে আমার সাথে

চালাকি করছ?

- চালাকি নয় বিয়াই! সত্যিই বলছি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে, আপনি গ্রামের পাঁচটা লোককে জিজ্ঞাসা করুন।

- গ্রামের লোক তোমার ডিপোজিটের খবর কি জানবে? আমি ও সব শুনতে চাই না। আমি চাই জমি। আর তা না হলে, আজকেই তোমার মেয়েকে আমার ঘর থেকে তাড়িয়ে দেব!

সলীমুদ্দীন বাবুকে চিনত। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে বড় কাকুতি-মিনতে ক'রে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন বিয়াই। এই বাড়িটুকু নিয়ে আপনি ক্ষান্ত হন।'

বাবু দলীল লিখতে আদেশ করল। সলীমুদ্দীন আবার চিন্তা করে দেখল যে, সে যদি এখন বাড়িটা তার নামে লিখে দেয়, তবে তার আর কোথাও স্থান হবে না। অতএব আবারো অনুরোধ করে বলল, 'বিয়াই! এখন তো আমি মরে যাচ্ছি না। অতএব কিছুদিন পরেই লেখালিখি করবেন।

বাবু ভ্রূকুটি হেনে বলল, 'তুমি না মরলেও আমি মরে যাব যে। আর এখন না নিলে তুমি এটাও বিক্রি করে খাবে।'

সলীম বলল, 'কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমি বাড়ি লিখে দিলে পুনরায় এ বাড়িতে আমি বাস করতে পারব।'

বাবু বড় বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যতদিন বাঁচবে ততদিন বাস করবে।'

কিন্তু সলীমুদ্দীনের কোনমতেই বিশ্বাস হল না। যেমন করে আজ লিখে নিতে এসেছে, ঠিক তেমনি করেই যে লিখে নেওয়ার পর একদিন তাকে এ বাড়ির অধিকার হতে বঞ্চিত করবে না - তাতে কোন নিশ্চয়তা নেই।

কিন্তু বাবু সহজ নয়। বলল, 'দেখ বাপু! না দিলে মেয়েকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

সলীম বলল, 'তাহলে আমি মেয়ে অথবা জামায়ের নামে রেজিষ্ট্রী করব।'

বাবু রেগে বলল, 'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আমি চোর, দাগাবাজ, তাই না?'

- না না, আমি তা বলছি না।

- তাই তো বলা হচ্ছে।

মুহুরী বলল, চিন্তার কি? আপনাকে তো আজীবন থাকার কথা দিচ্ছেন।

সলীমুদ্দীন আর কি বলবে? আরো কিছু চিন্তা, কারো সাথে পরামর্শ করার সময় ও সুযোগ পেল না। জামাইকে এক কথা জিজ্ঞাসা করার সময়টুকুও দিল না ধনলোভী বাবু। সব গেল তার। পিতা গেল, জমি গেল। এখন বাড়িটা গেলেও যদি বদরু ফিরে আসে, তবে সে আর

কি চায়? বদরুর সুখ হলে তার গাছ তলাতেও দিন কেটে যাবে।

অতঃপর দলীল লেখা হল। সলীম স্বাক্ষর করে দিল। তাতে জীবন-স্বত্ব কি না তা উল্লেখ করা হল না।

দিন অতিবাহিত হতে লাগল। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। সলীম আর জামাইয়ের সাথে দেখা করে তার পিতার ঘটনা খুলে বলল না। সে পণ না নিয়ে বিয়ে করেছে ঠিকই, কিন্তু তার বাপ যে পণলোভ মন থেকে দূর করতে পারেনি, সে কথা সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না।

যালেম বাবুর যালেমা বিবির ইচ্ছা তখনও পূরণ হয়নি। মনের হিংসা-জ্বালা তখনও প্রশমিত হয়নি। স্বামীকে বলল, 'ছাই করেছ তুমি। ঘর যদি দখলই না হল, তাহলে আর কি লাভ হল? ঘর দখল কর।'

- কিন্তু তা কিভাবে করা যাবে?

- ঘর ভেঙ্গে পুকুর কর, মাছ হবে। বাগান কর, গাছ হবে।

- চমৎকার বুদ্ধি!

যেই কথা সেই কাজ। সেদিনে গিয়ে বিয়াইকে বলে এল, 'দশদিনের মধ্যে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। কারণ এ বাড়ি ভেঙ্গে সে অন্য কিছু করবে!'

বদরুর পিতা এবার কি করবে, কোথায় যাবে কিছু খুঁজে পেল না। কে দেবে তাকে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই? কবরে ঠাঁই নেওয়ার সুযোগ থাকলে সে তাই করত। এখন সে কি করবে। ধূর্ত বিয়াই জীবন কাটাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হঠাৎ তার প্রয়োজন পড়ে গেল বাড়ির?

সলীম মনে মনে যেমন দুঃখিত হল, তেমনি ক্ষুব্ধও হল। কাউকে কিছু না বলে মরিয়া হয়ে সেই ঘরেই বাস করতে লাগল।

দশদিন অতিবাহিত হলে বিয়াই পাঁচটি লেবার, গাঁইতি, কুড়ুল, শাবল ইত্যাদি নিয়ে হাজির হল। তাদেরকে দেখে সলীমুদ্দীনের হৃৎপিন্ড শুকিয়ে গেল। বিয়াই লেবারদের উদ্দেশ্যে বলল, 'চালটা আগে ছাড়া।'

একি কথা? সলীমুদ্দীন একদৃষ্টে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাবু বিদ্রূপ হাসি হেসে বলল, 'কি হে স্বপ্ন দেখছ নাকি?'

সলীমুদ্দীন কথা বলল না। শরীরটা যেন রাগে অধীর হয়ে উঠল। শক্তি থাকলে শয়তানটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত এ ঘর হতে।

হঠাৎ মরমর্ শব্দে সলীমুদ্দীন চমকে উঠল। দুই চোখে ঘন কালো অন্ধকার দেখতে লাগল। আজ তার সামনে পূর্বপুরুষদের ভিটে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। আজ প্রায় শত বছরের পুরনো যে বংশ-স্মৃতির যেটুকু দন্ডায়মান ছিল, সেটুকুও আজ শয়তান বাবুর

হাতে ধ্বংস ও বিস্মৃত হতে চলেছে। যা ছিল পিতার স্মৃতি, আজ তা স্বার্থপর বাবুর বরপণ স্মৃতিতে পরিণত হতে চলেছে। এ কি প্রাণে সহ্য হয়? তা কি চোখে দেখা যায়? রাগ অথচ ধীর কণ্ঠে বলল, ‘কি করেন মশায়? তৈরী বাড়িকে ভেঙ্গে ফেলবেন? আপনি কি মাতাল হয়েছেন, নাকি পাগল?’

বাবু অট্টহাসি হেসে বলল, ‘আমি পাগল? নিজের জিনিস যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। কিন্তু তুমি পাগল বলার কে? তুমিই বদ্ধ পাগল, মত্ত মাতাল। চুপ করে দেখ, নচেৎ দূর হয়ে যাও এখান হতে।’

সলীমুদ্দীন বলল, ‘কি? আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান? আপনার সাহস তো কম নয়?’

- কি বলছ হে? বাড়ি কার?

সলীমুদ্দীন জোর দিয়ে বলল, ‘বাড়ি আমার।’

বাবু বিকট হাসি হেসে বলল, ‘তোমার বাড়ি?’

- আমার নয় তো ভূতের? খবরদার! ওর একটা কোণেও হাত দেবেন না বলছি।’

- দিলে পরে?

- লোক ডাকব, বিচার করব, শাস্তি দেব।

বাবু পুনরায় হেসে বলল, ‘সর্বনাশ! এত বড় কথা? বেশ আমি বাড়ি ভাঙ্গছি, তুমি লোক ডাকো, বিচার কর।

চালের যখন এক চতুর্থাংশ ভাঙ্গা হয়ে গেল, তখন সলীমুদ্দীন আর দাঁড়িয়ে না থেকে দৌড়ে গিয়ে মোড়লকে, আরো পাঁচটা লোককে ডেকে তার বাড়ির পাশে হাজির করল।

তারা কৈফিয়ত করলে বাবু দলীলের নকল কপি দেখিয়ে বলল, ‘বলুন, এ বাড়ি কার?’

মোড়ল বলল, ‘এ টিপসহি কি সলিমের?’

সলীমুদ্দীন চুপ করে রইল। কিছু পরে বলল, ‘সহি আমার কিন্তু জীবন-স্বত্ব ছেড়ে রাখার কথা হয়েছে।’

শুনে মোড়ল স্তম্ভিত হল। বাবুর উদ্দেশে আক্ষেপের সুরে বলল, ‘তাহলে তো আপনার হরগিজ অন্যায়। কথা দিয়ে শুধু শুধু ঘরে ঘরে ঝামেলা বাধাতে চাচ্ছেন কেন? আপনার ছেলে একজন সম্মানিত মাষ্টার, বড় ভদ্র। সে জানলে কি বলবে?’

বাবু গম্ভীর স্বরে বলল, ‘বাড়ি যখন আমার নামে এবং তার বৈধ দলীল আছে, তখন তা আমার। সুতরাং আমার বাড়ি নিয়ে আমি যখন যা খুশী তাই করতে পারি, তাতে আপনারা আমাকে বাধা দিতে পারেন না, থানা-পুলিশও না।’

ইতিমধ্যে আরো লোকজন উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল সেখানে। সলীম শুধু বদরুর কথা

খেয়াল করে উচ্চবাচ্য করতে পারছিল না। উপস্থিত লোকজনদের একজন বলে উঠল, ‘যার নিয়ে আজ আপনি আমার বলছেন, তাকে কোন্ মুখে কষ্ট দিতে চান?’

বাবু রেগে উঠল। গম্‌গম্ শব্দে বলল, ‘ভেবে-চিন্তে কথা বলবেন। আমি ওর কাছ হতে বাড়ি মাগনা নিইনি, ছিনিয়েও নিইনি। মেয়ের বিয়েতে যৌতুকের পরিবর্তে জমি ও বাড়িটা দেওয়ার চুক্তি ছিল। এখন আপনারাই ওকে জিজ্ঞাসা করুন, জমি কোথায়?’

সকলেই ক্ষণকাল নীরব থাকল। অতঃপর একজন বলে উঠল, ‘মাষ্টার বিনাপণে বিয়ে করেছে।’

- কিন্তু আমি মাষ্টারের বাপ। আমি তাতে রাজি নই।

মোড়ল বলল, ‘আপনার মত বড়লোক তো নয় যে, এতটুকু দিলে তার ক্ষতি হবে না। ইচ্ছা করলে আপনিই পারতেন, এতবড় জমিদার সম লোক হয়ে সামান্য জমি ও বাড়ির লোভ বর্জন করতে। আর তাতে আপনার মত লোকের কিছু বয়ে যেত না। আর কথা হওয়ার পর যদি বাড়িটা আপনার একান্ত প্রয়োজনই হয়, তাহলে সে তো আপনার পুত্রবধূর পিতা, সে আপনার বিয়াই। সুতরাং আপনিই তার থাকার ব্যবস্থা করে দিন।’

বাবু বলল, ‘সে দায়িত্ব আমার কেন? আমি তো বলেই গিয়েছিলাম, দশদিনের মধ্যে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করতে। আমার এ বাড়ির জায়গা বিশেষ প্রয়োজন আছে।’

মোড়ল সহ প্রায় সকলেই বলে উঠল, ‘তাহলে তো আপনার গরীবের প্রতি জুলুম করা হবে। তার তো একটি মেয়ে ছাড়া অন্য কেউ নেই।’

‘তা জানি না’ বলে বাবু মুখ ফিরিয়ে নিল।

কেউ বলল, ‘মাষ্টারকে খবর দেন।’

কেউ বলল, ‘থানায় খবর কর।’

কেউ বলল, ‘পঞ্চায়েতকে জানান।’

প্রায় সকলে একবাক্যে বলল, ‘আমরা গ্রামের লোক থাকতে এ অন্যায় হতে দেব না।’

এবার বাবু বুঝল, এ কাজ আর ঠিক হবে না। যদিও তার পার্টির জোর আছে, থানায় হাত আছে এবং পঞ্চায়েতে লোক আছে, তবুও যেহেতু সে ভিন গাঁয়ের, সেহেতু অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলল, ‘তাহলে আমার পাওনা আমি পাব না?’

মোড়ল বলল, ‘আপনার প্রতিশ্রুতি অনুসারে সলিমের মৃত্যুর পর এ বাড়ি আপনার প্রাপ্য, এখন নয়।’

বাবু আর কিছু বলল না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে লেবারদেরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

সলীমুদ্দীন আশ্বস্ত হল। পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে গ্রামের লোক তার যে সহযোগিতা করল, তাতে সকলকেই ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু সেই সাথে এই আশঙ্কাও ব্যক্ত করল যে, বাবু কাবু হয়ে হয়তো বদরুর প্রতি অত্যাচার চালাবে। এখানে না মিটানো রাগ হয়তো বদরুর উপর ঝাড়বে। সুতরাং বদরুর জন্য মনটা পাখীর মত তার কাছে উড়ে যেতে চাইল। একে তো সে মাতৃহীনা, তার উপরে দাদুকে শেষ জীবনের মত না দেখতে পাওয়ার শোক-ব্যথা, তারপর আবার আব্বাকে মাঝে মাঝে একবার ক'রে এক নয়নে দেখার পথও হয়তো রুদ্ধ হয়ে এল। খাঁচার ভিতরে যেন আরো একটি খাঁচা তৈরী হয়ে গেল।

পরদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিল, বাড়িটা বড় বিশ্রী হয়ে রয়েছে। যেটুকু জিনিস-পত্র আছে তাও যত্র-তত্র অপারিপাট্যভাবে পড়ে আছে। বাড়ির দেওয়ালে এখানে সেখানে ঝুল পড়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন এ বাড়িতে কেউ বাস করে না। এ কোন আদি যুগের পুরাতন বাড়ি।

আহা! যে কালে বদরু ছিল, সে কালে বাড়িখানাকে কতই না সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখত, সদা-সর্বদা পরিষ্কার রাখত, আঙিনায় ফুল গাছ লাগাত, সুন্দর করে নিকায়ে রাখত। আজ সে পরের বাড়িতে।

সাত-পাঁচ চিন্তার ধারা যত ঘোর হয়ে এল, রাত্রিও তত গভীর হয়ে এল। এমনি করে কখন চিন্তাসিন্ধু সন্তরণ করে পাড়ি দিয়ে নিদ্রা-দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিল।

কিঞ্চিৎকাল পর অকস্মাৎ সে লাফ দিয়ে উঠল। তখন চালের চারিদিকে আগুন আর আগুন! পৃষ্ঠদেশে আগুন পড়ে কিছুটা পুড়ে গিয়েছিল। সলীমুদ্দীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে হতবাক থাকল। হঠাৎ এ কি হল? চারিদিক অগ্নি পরিলক্ষিত হল। এ মত অগ্নিবন্দী অবস্থায় একমাত্র মরণই যে শেষ উপায় তা বুঝে তার বাক্য রুদ্ধ হয়ে গেল। ভাবল, চিৎকার করে প্রতিবেশীদেরকে জাগিয়ে তুলবে, কিন্তু তার মুখ থেকে আর বাক্যই সরল না। ঘরের ভিতরে প্রাণ নিয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। বের হতে চেষ্টা করলেও ধোঁয়ার কারণে দরজাও খুঁজে পেল না। পরিশেষে নিরাশ হয়ে যেদিকের চাল কাল ছাড়ানো হয়েছিল, সেদিকে আগুন পড়েনি বলে সেই দিককার কোণে গা এলিয়ে কোন রকম জীবন রক্ষা করল। ঘর পুড়ে ছাই হল। বাড়িটির সন্নিকটে কোন বাড়ি না থাকার ফলে সে নিশুতি রাত্রে আগুনের কথা কেউ বুঝতেও পারল না।

আগুন যখন ঠান্ডা হয়ে এল, তখন সলীমুদ্দীন প্রায় জ্ঞানশূন্য। তবুও সেই জ্ঞানেই সে অনুমান করল যে, এ কাজ সেই চরম ধড়িবাজ পণলোভী ধনলোভী বাবুর। সেই বাবুই গরীবের এই মাথা গোঁজার স্থানটুকুতে অগ্নি-সংযোগ করেছে। সেই বাবুই কাঙ্গালের ধন হস্তগত করার জন্য পাগল হয়ে গেছে। গতকালের অপমানের বদলা নেওয়ার জন্য সে এই নিকৃষ্ট কাজ করেছে।

সলীমুদ্দীন সেখান হতে বের হয়ে এসে দেখল, কিছুই নেই। সবই ছাই। প্রতিবেশীর কোন লোকও আসেনি সে আগুন নির্বাপিত করতে। এসেছিল শুধু তার দুই চক্ষু হতে প্রবাহিত বারিধারা। কেবল সেই উৎপীড়িতাশ্রুই নিভাতে এসেছিল এ গরীব বেচারার বাড়িতে ধরা আগুনকে।

আহা! সে কি কম বেদনা? হৃদয় ফেটে গেল, কলিজা জ্বলে গেল, অন্তরের অন্তস্তল থেকে বের হয়ে এল, 'আল্লাহ! তুমি এর প্রতিশোধ নিও।' তারপর রাত্রের অন্ধকারেই সে গা ঢাকা নিল।

(২৩)

শনিবার স্বামী বাড়ি ফিরলে বদরু রাত্রে আনন্দের সাথে বিবাহের কথা তুলল। বলল, 'দাসীর জন্য আপনার শখ-আহ্লাদ সব গেল। বিবাহের কোন আনন্দ-স্বাদ অনুভব করতে পেলেন না।'

স্বামী বলল, 'তোমাকে পেয়েছি, আমার এটাই বড় আনন্দ। বাড়ির লোকের অবস্থা বল। কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করছ?'

- পরিবর্তনের একটাই মাত্র পথ। আর তা হল বরপণ স্বরূপ কিছু পরধন লাভ।

- কারণ কি? তোমার চরিত্র-ব্যবহার এত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও তোমার প্রতি ওরা সন্তুষ্ট নয় কেন?

- দোষ একটাই। আমি গরীবের মেয়ে। গরীব বলেই এমন হতভাগিনী যে, দাদু চিরদিনকার মত এ দুনিয়া হতে চলে গেল, অথচ তাকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না। 'বিনা পণের বউ' বলেই তো জন্মদাতা বাপকে দেখতে পাই না। এ বাড়িতে সে কোন মান পায় না। বাপের বাড়ি থেকে কানা কড়িও আনতে পারিনি বলেই তো এ বাড়িতে আমি বঞ্চিতা, অবহেলিতা, লাঞ্ছিতা।'

কথাগুলি বলতে বলতে বদরুর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। স্বামী লজ্জিত হয়ে বড় আদর সুরে বলল, 'না না। আসলে আমি বাড়িতে থাকতে পাই না বলে তোমার সমস্যাটা বেশী হয়। সবুর কর। একদিন সুখ পাবে, যেদিন সবাই পৃথক হয়ে যাবে। আর বিনা পণে বিয়ে তো আমি নিজে করেছি। আমি না করলে কি তোমার আব্বা আমার ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিত। এ কথা যারা বুঝে না, তারা আসলে বোকা। আর যারা তা বুঝছে না, তাদের সাথে জোর করে কোন লাভ নেই। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত করুক। ধীর পানিতে পাথর কাটে। তোমার-আমার ধৈর্যের পানি দিয়ে যুলুমের পাথর ক্ষয় করতে হবে বদরু! বাকী থাকল তোমার আব্বার কথা। তাতে অবশ্যই আমার বাড়ির লোকের ত্রুটি আছে। অবশ্য

অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আছে আমারও। চল, কালকেই আব্বার সাথে একবার দেখা করে আসি।’

মাষ্টার সকালে উঠে কাউকে কিছু না বলে বদরুকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি রওনা হল। বদরু আজ এত দুঃখের মাঝেও যেমন পিঞ্জারাবদ্ধ ময়না মুক্তি পেয়ে আকাশে সানন্দে উড়ে যায়, তেমনি সেও স্বামীর সাথে বড় উল্লাসের সাথে পথ চলছিল। শতমুখী শোকের তরঙ্গাভিঘাতে এ সুখ যেন কোথায় লুকিয়ে ছিল, হঠাৎ জীবন-সাথী স্বামীর সাথে পথ চলতে পথিমধ্যে সে সাময়িক সুখ কোথা হতে ফিরে এল। মন চায়, তারা এমন কোথাও চলে যাক, যেখানে সে আর ও থাকবে। আর তাদের সাথে কেউ থাকবে না।

গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে সম্মুখস্থ গোরভূমির সারিবদ্ধ গোরের দিকে নজর পড়তেই আবার শোক উথলে উঠল। যে ভূমির নিচে মাতা শয়ন করে আছে। আবার সেখানেই পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ স্থান গ্রহণ করেছে। দুআ করার সাথে সাথে তার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। পিতামহের কবর বুঝতে বাকী রইল না। মরার সময় যাকে চোখে দেখতে পায়নি, সেই দেখার তৃপ্তি যেন তার কবর দেখে লাভ করল।

অতঃপর অগ্রসর হল বাড়ির দিকে। যেখানে সে তার স্নেহময় পিতাকে পরম তৃপ্তির সাথে দর্শন করবে। কিন্তু কিছু দূর যেতেই বাড়ির জায়গা ফাঁকা পরিদৃষ্ট হল। মাষ্টারও বলল, ‘কই তোমাদের বাড়ি? পথ ভুল করলাম নাকি?’

বদরু বলল, ‘না তো। কিন্তু বাড়ির চাল-ছপ্পর নেই কেন?’

কাছে গিয়ে দেখল, বাড়ি অগ্নিদগ্ধ হয়ে সব শেষ। বদরু উচ্চরোলে কেঁদে উঠল। স্বামীও ব্যাপার বুঝে উঠতে পারল না। দূর থেকে যারা তাদেরকে দেখতে পায়, তারাই বলে, ‘আহারে! দুঃখিনী মেয়ে কাউকে দেখতে পেল না।’

বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখল, কেবল দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবেশীদের মুখে শুনতে পেল, আগুন গভীর রাতে হয়েছে। কিন্তু ঠিক কখন হয়েছে, কিভাবে হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। আর তার আব্বা যে কোথায় আছে তারও কেউ সন্ধান পায়নি। তবে অনেকের অনুমান, সে ঘরের ভিতরে ঘুমন্ত অবস্থায় থেকে আগুনে পুড়ে একেবারে ছাইয়ের সাথে মিশে গেছে!

আহা! বদরু সেসব শুনে কাতরে ধূলি-লুণ্ঠিতা হয়ে পড়ল। কান্নায় বস্ত্রাঞ্চল ভিজে গেল। প্রতিবেশীর একজন পানি আনলে সে তা স্পর্শ পর্যন্ত করল না। হায়রে! ছোটবেলায় মা গেল, বন্দিনী থাকা অবস্থায় পিতামহ গেল, কিভাবে বাড়িখানা গেল, আবার পিতাও হতভাগী কন্যাকে দুঃখ ভোগ করতে রেখে গেল! হায়রে এ দুঃখের অমানিশার কখন অবসান ঘটবে? এ কষ্টের রাত্রি কখন পোহাবে?

অনেকেই নিজ বাড়িতে আসতে বলল, কিন্তু কারো কথায় রাজি না হয়ে মাষ্টার ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। বদরু স্বামীকে বলল, ‘ওগো! আপনি ফিরে যান। আমি আর যাব না। আমিও আব্বার সাথী হব।’

স্বামী হতভম্ভ হয়ে বলল, ‘ছিঃ বদরু! ও কথা বলতে নেই, মসীবতে ধৈর্য হারাতে নেই। তুমি যে সতী মেয়ে। জান না কি, আত্মহত্যা মহাপাপ?’

বুঝিয়ে বদরুর মনকে শক্ত করে আবার নিজ বাড়ি অভিমুখে রওনা দিল মাষ্টার। একটি লোক তাকে সম্বোধন করে কি বলতে যাচ্ছিল। পিছন থেকে মোড়ল তাকে বাধা দিয়ে কিছু বলতে দিল না।

বাড়ি ফিরেও বদরু কেঁদে কেঁদে জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল। স্বামীর সান্ত্বনাদানে শোকব্যথা অনেক হাল্কা হল।

বেলা যখন এগারটা তখনও বদরু কাঁদছে। হঠাৎ হিংস্রমনা রুক্ষমূর্তি শাশুড়ী এসে বলল, ‘কি লো! লুকিয়ে বাপের ঘর গিয়ে দাদুকে কবর খুঁড়ে দেখে এলি নাকি? তা বাপু আর শোক কিসের?’

শাশুড়ী আগুনের উপর ঘি ফেললে আগুন দ্বিগুণ হয়ে হৃদয়ে জ্বলে উঠল। তাদের বাড়ির খবর যেহেতু কেউ জানার আগ্রহ রাখে না, সেহেতু সে আর খুলে কিছু বলল না, আর মাষ্টারও কোন খবর জানালো না। অবশ্য আসল খবর তার মা-বাপ তো ভালোরূপেই জানে।

শাশুড়ী পুনরায় উন্নাসিকতার সুরে বলল, ‘আর কাঁদতে হবে না। বেলা অনেক হয়েছে। তাড়াতাড়ি করে ভাত চাপা।’

বদরু অশ্রু মুছতে মুছতে রান্নাশালের উদ্দেশে রওনা দিল।

স্বামী চলে গেলে বদরুর দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়ার মত আর কেউ রইল না। কাঞ্চন ছাড়া এ বাড়ির সকলকে শত্রু মনে হয়। আজকাল শ্বশুরকেও দেখে মনে হয় আজরাঈল। তার গুপ্ত অত্যাচারের সে কিছুই জানতে পারল না। দুঃখ-কষ্ট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকল। শাশুড়ীর গালাগালি, বড় বউ-এর কটাক্ষ, গঞ্জনা, শ্বশুর-ভাশুরের গুমুস-গামুস এ সব যেন দিনের দিন বেড়েই চলল। শুধুমাত্র একটা মানুষের আশা-ভরসায় এতগুলো মানুষের পূজা করে যাওয়া, একটা মানুষের প্রেম লাভের জন্য এত মানুষের আঘাত সহ্য করা সহজ কথা নয়। ধীরে ধীরে যেন স্বামীর প্রতিও আস্থা হারিয়ে ফেলতে লাগল, জীবনের সুখ-শান্তির আশা-ভরসা ত্যাগ করে বসল। ভাবল, এ দুনিয়ায় হয়তো তার ভাগ্যে সুখই নেই। কিন্তু পরকালের সুখের জন্য তো স্বামী-সন্তুষ্টি জরুরী। তাহলে তাকেই বা অসন্তুষ্ট করে কিভাবে? সব যায় যাক, সে না গেলেই তো হয়। কিন্তু সবাই যে তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলছে! সে বাড়িতে অবস্থান করলেও অনেকটা হাল্কা হত, কিন্তু চাকুরির জীবন যে তার সুখের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একান্ত আপন বলতে সবাই তো চলে গেল। কেবল সেই বাকী থাকল নশ্বর এ

সংসারের অবিরত দুঃখ-জ্বালা সইবার জন্য। বড় হয়ে মায়ের স্নেহ-বাৎসল্য থেকে বঞ্চিতা হল, পিতা-পিতামহের স্নেহ থেকেও রিক্তা হয়ে গেল। এখন সে কেন বেঁচে আছে? স্বামীর সুখও সাময়িক, ক্ষণিকের। এতবড় কুরবানী সে দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ছে। দেহে যেন রক্ত নেই, মনে কোন বল নেই। কটু কথা শুনে শুনে মন তিক্ত হয়ে গেছে। এ জীবনে তার সুখ কিসের?

চিন্তার উন্মুক্ত আকাশ পথে বিচরণ করতে করতে নিদ্রার আলস্য তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'আর চিন্তা করো না চিন্তামণি! এবার তুমি আমার কোলে এস। সব দুঃখ-জ্বালা ধুয়ে-মুছে চলে যাক তোমার ঐ জ্বালাময় শোকার্ত হৃদয় থেকে।'

হঠাৎ বদরু স্বপ্নপুরীতে বিচরণ করতে লাগল। যাতনার নানা স্বপ্ন, আব্বার নানা আদরের কথার স্বপ্ন এবং স্বামী-সোহাগের সুখময় স্বপ্ন দেখতে দেখতে এক সময় সে দেখল তার স্নেহময় পিতামহকে। সে যেন কোন্ জঙ্গলে বিচরণ করছে। আর সে তাকে বলছে, 'অন্ধকার ছেয়ে আসছে মা বদরু! এবার তুই ফিরে আয়।'

ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে বদরু চমকে উঠল। এ কি? দাদু তাকে ডাকছে। বড় মায়া-মমতা ভরা, মানবতার স্নেহমাখা, মধুরতার মধুভরা ডাক। 'এবার তুই ফিরে আয়!' কিন্তু যাবার পথ কোথায়? কি উপায়ে অন্ধকার জঙ্গল ত্যাগ করে বাড়ি ফিরবে সে? ফিরে যাওয়ার পথ বলে দাও পিতামহ! সে তো তোমাদের কাছেই ফিরে যেতে চায়।

আর ঘুম হল না। শুধু মনে হয় ঐ আকাশে তারকা যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলছে, 'বদরু আয়!'

বদরু উঠে বসল। ভিতরটা যেন সাঁই সাঁই করতে লাগল। বদরু কান খাড়া করে নিশুতি নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারের কাল্পনিক পরিবেশে সে যেন শুনতে লাগল, 'আয়, আয়।'

কিছুক্ষণ ভয়ে ভয়ে দুশ্চিন্তার পর আবার শয়ন করল। কিয়ৎক্ষণ পর মোরগের ডাকে জেগে উঠেও সে কল্পনা করল, কে যেন বলছে, 'বদরু ফিরে আয়!'

ভোর হয়েছে বুঝে সে গাত্রোত্থান ক'রে ফজরের নামায পড়তে গেল।

নামায পড়া শেষ হলে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, শ্বশুর-আব্বা দাঁড়িয়ে। এত সকালে সে কেন? কোন্ উদ্দেশ্যে তার কামরায় এল? বদরু না বুঝে মুখ নিচু করে বলল, 'আব্বা! কিছু বলছেন?'

ছাই চাপা আগুনের মত জ্বলা মন নিয়ে গম্ভীর সুরে বলল, 'বদরু! তোকে আজকের মধ্যে এ ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

হঠাৎ আবার এ কি হল? বদরুর সর্বশরীর যেন থর্থর্ করে কেঁপে উঠল। এ কোন্ সিদ্ধান্ত? কেন এ সিদ্ধান্ত? হয়তো বা এ জন্য যে, সে তাদের কেউ নয়। পণ না দিতে

পারলে কি শ্বশুর-ঘরে কারো মন পাওয়া যায়?

কিন্তু বদরু মহা সমস্যায় পড়ল। যেতে হলে যাবে কোথায়? কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? তার তো এ জগতে কেউ নেই। মনে মনে ভাবল, এখনো তার স্বামী আছে। প্রতিজ্ঞা করল, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাকে জোর ক'রে বের না করে দিয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এ ঘর হতে বের হচ্ছে না। আর জোর ক'রে বের করতে কেউ পারবেও না। গ্রাম আছে, গ্রামের সমাজ আছে। এ গ্রামে তার কুরআনের অনেক ছাত্রী আছে। কোন ভয় নেই। হুমকি শোনা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার মনে প্রশ্ন, হঠাৎ এ বহিষ্কারের আদেশ কেন?

(২৪)

এ দিকে বাস্তহারা সলীমুদ্দীন ঘুরতে ঘুরতে সেদিন সাত সকালে শামসুলদের বাড়ির দরজায় পাগলের মত বসেছিল। শামসুল তাকে চিনতে পারল। দেখে যেমন দুঃখিত হল, তেমনি খুশীও হল এই কারণে যে, সে এখনো বেঁচে আছে। বাড়িতে তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে দিয়ে সে এ খুশীর খবর সেই মানুষটির কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল, যে মানুষটি তার কাছে এবং তার ঐ চাচার কাছে সবার চেয়ে প্রিয়। মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে মাঠপথে পাড়ি দিল।

বদরুর বাড়িতে যখন উঠল, তখন বদরু থালা-বাটি মাজছে, তার শ্বশুর দাঁতন করছে। খবর শুনতেই সকলে অবাক হল। বদরু খুশীতে নানা কথা শামসুলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। শ্বশুর-শাশুড়ী ভিতরে ভিতরে লাভার মত জ্বলে বিস্ফোরণ হতে চাচ্ছিল। কিন্তু চালাক শাশুড়ী বাবুকে ডেকে পরামর্শ করে বলল, 'ছোঁড়াটা এর আগেও অনেকবার এখানে এসেছে। নূরোর হুঁশ নেই। এই সুযোগে ওকে ওর সাথে পাঠিয়ে দাও, ঘটিয়ে দাও, পটিয়ে দাও।'

চালবাজ বাবু বড় খুশীর অভিনয় করে শামসুলের আপ্যায়ন করল। বদরুকে বলল, 'শামসুল তোমাদের আত্মীয় হয়, আমাদের নূরোরও বন্ধু। ওকে চা ক'রে দাও। তারপর ওর সাথেই না হয় গিয়ে তোমার আব্বাকে একবার দেখে এসো।'

বদরু শুনে তো অবাক! এমন নাটকীয় পরিবর্তনের রহস্য সে বুঝতে পারল না। অবাক দৃষ্টিতে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে রইল। শ্বশুর বলল, 'হ্যাঁ, নূরো কিছু বলবে না। আমি আছি তো। তাছাড়া তোমার বাপটাও মরা বেঁচে উঠল। তুমিও বড় শোকে ভেঙ্গে পড়েছ। আমরা পরে একদিন গিয়ে দেখা করে আসব। আজ শনিবার। নূরো এলেই ওকে পাঠিয়ে দেব।'

বদরু কি বলে যে শ্বশুরকে ধন্যবাদ দেবে, তা আর খুঁজে পাচ্ছিল না। শুধু বলল, 'আল্লাহ আপনার ভালাই করবে আব্বা!'

কিন্তু শামসুলের মোটর সাইকেলের পিছনে বসে সে যুবতী যাবে কিভাবে?

শাশুড়ী সাহস দিয়ে বলল, 'বিপদের সময় অত মানা মানতে হয় না।'

বড় বউ বলল, 'আমি আমার দোলাভাইয়ের মোটর সাইকেলের পিছনে যাই। কি হবে? সামান্যই তো পথ!'

সকলের সাহস ও উৎসাহদানে উৎসাহিতা হয়ে বদরু শামসুলের সাথে বের হয়ে গেল। পথিমধ্যে শামসুলের মনে সকল স্মৃতি জেগে উঠল। রোমান্সী চালে গাড়ি চালাতে চালাতে বদরুর সাথে খোশ গল্পে নিজেকে বড় ধন্য মনে করতে লাগল। জীবনের এই সুযোগে তারা এত কাছাকাছি হতে পেরেছে দেখে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। যাকে চেয়েছিল একান্ত গোপনে, হৃদয়ের গহীন কোণে, মনের নিবিড় বনে, আজ সে এত কাছে, তার পাশে! এটা একটা বড় সৌভাগ্য তার, যদিও সে অন্যের বন্ধনে।

শামসুল কথা তোলে, বদরু লজ্জায় সেসব কথা চাপা দেয়। বলে, 'বিপদের সময় বিপদের কথা বলাই উত্তম।'

কিন্তু আরো কত বড় বিপদ যে আসছে, তাদের কেউ কিছু বুঝতে পারল না।

বদরুর সাথে হারানো পিতার দেখা হল। অশ্রু বিনিময়ের মাঝে কত কথা আলোচনা হল, কিন্তু কুলের কথা খুলে আর বলল না। যাতে বদরু দুঃখ না পায়।

এমনিভাবে শামসুলদের বাড়িতে মেহমানি করে সন্ধ্যা হয়ে গেল; কিন্তু মাষ্টার কই এল না। বদরুর মনে সন্দেহ ও আশঙ্কার ছায়া ঘন নিবিড় হয়ে উঠতে লাগল। শামসুল আশ্বাস দিল, যদি আজ না আসে, কাল তোমাকে দিয়ে আসব, আর খবর নিয়ে আসব।

এদিকে মাষ্টার বাড়ি পৌঁছে শুনল, তার বদরু শামসুল নামক এক ছেলের মোটর সাইকেলের পিছনে বসে তাদের বাড়ি গেছে। যেই শোনা, সেই মনে ধাঁ ক'রে মনে পড়ল, শামসুলের মুখে বদরুর প্রশংসা করার কথা।

- সে পরপুরুষের মোটর সাইকেলের পিছনে বসে গেল, অথচ তোমরা কেউ কিছু বললে না?

- বললেই কি সে মানবে নাকি? বাপের শোকে আকুল পারা হয়ে তার সাথে চলে গেল। আর ক্ষতিই কি? সে তো তোমার বন্ধু হয়?

- সে আমার বন্ধু। কিন্তু বদরুর কে?

- তারও নাকি 'বাঁশ তলাতে বিয়ল গাই, সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই।'

- কয়েকবার ছোঁড়াটা এল, আমার মনে সন্দেহ ছিল। কিন্তু তুই তো শিক্ষিত, বেশী বুঝিস!

- তার মানে তোমরা কি বলতে চাচ্ছ। তার সাথে তার গোপন সম্পর্ক আছে?

- সেটা আমাদের বলা কি দরকার? তুই বুঝে নেগা। বংশ-চরিত্র না দেখে চোখ বুজে

আবেগবশে বিয়ে করেছিস, তখন তো কাউকে জিজ্ঞেস করিসনি।

মাষ্টারের মন অধীর হয়ে পড়ল। সে এ সব কিছুই মানতে পারছে না, বিশ্বাসই হয় না। কিন্তু সে এইভাবে তার সাথে গেল কেন?

এই সময়ে ছোটমায়ের স্নেহময়ী কাঞ্চনও আগুনে ঘি ঢালার কাজ করল। সে বলল, 'ছোট আব্বা! আমার মনে ছিল না। শামসুল চাচা ছোটমাকে একটা চিঠি দিতে বলেছিল। কিন্তু আমি ভুলে গেছিলাম।'

- কই সেটা দেখি?

কাঞ্চন ছুটে গিয়ে বই-এর ভিতর থেকে চিঠিটা এনে মাষ্টারের হাতে দিল। সাথে সাথে সে সেটা খুলে পড়ে দেখল, তাতে লিখা ছিল,

'প্রিয়তমা বদরু! আমার বেহেশ্‌তী ফুল!

আমি ভালো নেই। আমি জানি তুমিও ভালো নেই। কিন্তু কি করি বলো? সবই ভাগ্য। কিন্তু জেনে রেখো এখনো আমি তোমাকে ভালবাসি।

"জীবনে এসেছে ক্লান্তি বেদনা কতবার ভেঙে পড়েছি,
শত সংঘাত বাধা ভয় সবি দু পায়ে দলিয়া এসেছি।
আমি ভুলি নাই তবু তোমারেই ভালোবেসেছি।।
কখনো জীবনে কাল বোশেখীর ঝড়
এসেছে গোপনে ভেঙে গেছে বাঁধা ঘর
কত হারানোর ব্যথারে ভুলিতে নীরবে গোপনে কেঁদেছি।
আমি ভুলি নাই তবু তোমারেই ভালোবেসেছি।।
অগ্নিশিখায় কভু এই মন নিজেরে করেছি ছাই,
কত অশ্রুর ধারায় এ বুক ভাসিয়েছি আমি হায়।
প্রাণের কত আশা হয়ে গেছে শুধু ভুল,
মনের শাখায় ফোটেনি সুরভি ফুল।
তোমায় জানাতে পারি নাই ব্যথা একা একা সব সয়েছি।
আমি ভুলি নাই তবু তোমারেই ভালোবেসেছি।।"

ইতি - তোমার শামসুল

আর কি কোন স্বামীর মন স্থির থাকতে পারে? ক্ষোভে, রাগে, দুঃখে মনে মনে বদরুকে শত ধিক্কার দিতে লাগল। এত বড় ধোঁকা দিল সে? সতীর বেশে ঢেমনের কাজ? নামাযীর বেশে বেশ্যার রূপ? হাত মে কুরআন, বগল মে গু'? শত ঘৃণায় সে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, যদি বদরু এখন কাছে থাকত, তাহলে তার ঐ সুন্দর চেহারাখানা এক থাপ্পড়ে বিকৃত করে দিত।

আবেগময় মানুষের মন যত তাড়াতাড়ি রাজী হয়, তত তাড়াতাড়ি নারাজও হয়। যত শীঘ্র গড়ে, তত শীঘ্র ভাঙ্গেও। আবেগে পড়ে তার গুণ শুনে তাকে জীবন-সঙ্গিনী বানিয়েছিল, আজও তার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে নিমেষের মধ্যে তাকে হৃদয় থেকে বহিষ্কার করে দিল! চিঠিটা পড়ে আর কাউকে কোন কথাটি না বলে চুপচাপ রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু প্রকৃতিস্থ হলে বিবেক দিয়ে বুঝতে শুরু করল। এমনও তো হতে পারে যে, এটি একটি পরিকল্পিত সাজানো ঘটনা। আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে পানাহ চেয়ে রাত্রি অতিবাহিত হল। ফজরের নামায পড়ে বাড়ি ফিরলে মা হঠাৎ ডাক দিল, ‘নূরো?’

মাতার ডাক শুনে চমকে থমকে দাঁড়িয়ে সাড়া দিল। গতরাত্রে স্বামীর সাথে পরিকল্পনার কথা ছেলেকে বলতে শুরু করল, ‘এখন কি করবি? ও মনে হয় বাপের অসীলায় ঐ ছেলের সাথে বেরিয়ে গেছে। মা-বাপের কথা তো শুনবি না। ও গেছে, যাক্‌গে। ওকে আর বাড়ি ফিরতে দিবি না। আবার তোর বিয়ে দেব।’

ছেলে বলল, ‘এমনিই নয় মা! আমাকে ব্যাপারটা বুঝতে দাও। ত্যাগ করতে হলে এমনি কেন? ওর মাথা নেড়া করে সতীত্বের আসল চেহারা লোককে দেখিয়ে তবে ছাড়ব।’

- কলি যুগ বাবা! মা-বাপের কথাকে পঁচা পাঁক মনে করিস্‌। কোথা হতে না দেখে না শুনে একটা ঢেমন মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে চলে এলি। ওঃ! বেশ্যা মাগীর আবার নামাযের ধুম কি? কুরআন পড়া ও পড়ানোর বাহার কি? একটা বাহানা নিয়ে থাকতে হবে তো? আহা! মনে করেছিলি, বড় ঈমানদার সতী বিবি পেয়েছিস্‌। এবার দেখ কি হয়? মান-সম্মান সব হারিয়ে গেল।

মাতার অনুরূপ কথা ‘পণের বউ’ ভাবীর নিকট হতেও শুনল। আর তাতে কি মন না ভাঙ্গে? তবুও তাদেরকে চুপ থাকতে বলল এবং শেষ পরিণাম না জানা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলল। যাতে সমাজে কেলেঙ্কারি না হয় এবং কারো প্রতি কোন প্রকার অন্যায়ও না হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটর সাইকেলের আওয়াজ শোনা গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, শামসুল ও বদরু এসে উপস্থিত! এ কেমন? বেরিয়ে গেলে আবার ফিরে আসবে কেন?

নেমেই উভয়ে একবাক্যে বলল, ‘আপনাকে পাঠিয়ে দেবে বলল আব্বা। কই আপনি গেলেন না যে?’

মাষ্টার কথার উত্তর করল না। তবে বুঝল, এতে কোন চক্রান্ত আছে। কিন্তু চক্রান্ত কার? মা-বাপের না স্ত্রীর?

বদরু ঘর ঢুকল। শামসুলকে কিছু না বলে দরজা বন্ধ করে দিল মাষ্টার। শামসুল সন্দেহে পড়ল বটে, কিন্তু তলিয়ে দেখল না। মোটর সাইকেল স্টার্ট করে সে ফিরে গেল।

বদরু বলতে লাগল, আব্বা মরেনি, বেঁচেই আছে। শামসুল ভাইদের ঘরেই আছে।

তবুও মাষ্টার কথা বলল না। এবারে বদরু বুঝল, নিশ্চয় শামসুলের পিছনে বসে যাওয়া তার ভুল হয়েছে। সে আবার বলতে শুরু করল, ‘আব্বা বেঁচে থাকার খবর নিয়ে এলে আপনার আব্বাই তার সাথে আমাকে যেতে বলল।’

মাষ্টার এবার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ল। মনে মনে বলল, আর চিঠি? রাগে-ক্ষোভে সে মুখই খুলল না। প্রকৃতিস্থ হতে সে মসজিদের দিকে বেরিয়ে গেল।

বদরু বুঝল, এবার তার দুর্ভাগ্য তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করবে। এতদিন যার আশা-ভরসায় অতিবাহিত হল, সেই যদি উপেক্ষার তীর হানে, তাহলে তার পায়ের মাটি কোথায়? যে ডাল ধরে দুঃখ-বন্যার কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিল, সেই ডালই ভেঙ্গে গেলে আর নিষ্কৃতি কোথায়?

সে রুমে বসেই থাকল। কেউ তার সাথে কথা বলল না, কেউ খেতেও বলল না। প্রতিবেশীর কোন মেয়ে এলে সেও তাকে দেখা করে না, কথা বলে না।

ধীরে ধীরে খবর পৌঁছে গেল প্রতিবেশীর বাড়িতে এবং পরপর গোটা গ্রামে। আর এটাই হল পাড়াগ্রামের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। গোটা গ্রাম যেন একটি বাড়ির মত। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে বদরুর কলঙ্ক নিয়ে নানা আলোচনা সভা শুরু হয়ে গেল। ‘বিনা পণের বউ’ পরিণত হল ‘অসতী বউ’-এ!

মাষ্টার কি করবে তা স্থির করতে পারছিল না। কত অপমান সহ্য করে পিতার কথা অমান্য করে মাতার নানা গালিগালাজ শুনে সে তাকে সসম্মানে বিবাহ করে ঘরে তুলল, আর আজ তার এই বৃহৎ প্রতিদান?

দিন অতিবাহিত হল। রাত্রিও গভীর হতে চলল। মাষ্টার তখনও ঘরে ফেরেনি। আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজ বিছানায় শয়ন করল। ভাবল, ডাল যখন ভেঙ্গেছে, তখন যা হবার তো হবেই। কেউ খুন করলে করুক। মরণই তো শেষ পরিণতি। সেটা তো সে চায়। বিধির কলম রদ হওয়ার নয়। যদি স্বামীর চরণেও সে স্থান না পায়, তাহলে এ রাতই তার শেষ রাত।

গভীর রাতে হুট্ শব্দে সে চকিত হয়ে উঠল। নিজের মনকে সে শক্ত করে স্বাভাবিক হয়ে প্রস্তুত থাকল। স্বামী ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে বলল, ‘এ ঢেমন! তুই নিচে শো!’

ঠান্ডা মাথায় বদরু বলল, ‘বিনা প্রমাণে অপবাদ দিচ্ছেন আমাকে। আল্লাহর ভয়

থাকলে প্রমাণ পেশ করুন, আমি ঢেমনামির কি করেছি?'

- তুই অসতী, ভ্রষ্টা, কুলটা! তুই আমাকে ধোঁকা দিয়েছিস। এ ঘর থেকে তুই বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এলি কেন?'

বদরু ভুল ভাঙ্গার জন্য ঘটনা আবার খুলে বলল। মাষ্টার রাগে চোখ লাল করে বলল, 'আর এই চিঠি?'

বদরু শান্ত মনেই বলল, 'এর খবর আমি জানি না।'

- কিন্তু আমি জানি। তোদের বিয়ের আগে থেকেই ভালবাসা দেখা-সাক্ষাৎ সবই ছিল। সুবিধা না দেখে মাঝখানে আমার সাথে ছলনা করলি তুই। আমি তোর মাথা নেড়া করে গোটা এলাকাকে দেখাব। সভার মাঝে যার প্রশংসা হয়েছে তার স্বরূপ সবাই জানতে পারবে।

- আপনার যাই ইচ্ছা তাই করুন। আমার কোন দোষ নেই। আগে ও এসেছে ঠিকই। কিন্তু আপনি আমাকে পর্দা করলে তার মনে আমার স্থান হত না। আমি কোনদিন তাকে আমার মনে স্থান দিইনি। আপনাকেই আমার বেহেশ্ত বলে মেনেছি। আপনারই গুণগান গেয়েছি। যা অন্যায়, তা শুধু দুশমনদের পরিকল্পিত কথা শুনে তার মোটর সাইকেলে চড়ে আমার হতভাগ্য বাপকে দেখতে যাওয়া। এখন আপনার ইচ্ছা।

বদরু কত কাঁদল, কত কাকুতি-মিনতি করল, কিন্তু যে হাড় ভেঙ্গে গেছে, তা কি আর জোড়া লাগে? যে মন ভেঙ্গে গেছে, তা কি আর গোটা হওয়ার আশা আছে? পা দুটি জড়িয়ে ধরে মানাবার কত চেষ্টা করল। কিন্তু না। লাথি মেরে ফেলে দিয়ে মাষ্টার রুম থেকে আবার বের হয়ে গেল। যেতে যেতে বলে গেল, 'সকাল হলে তুই বুঝবি, তুই সতী, না ঢেমন?'

জগতে যারা সত্যিকার সতী, তারা স্বামীর কাছে সতী হতে পারলে আর কারো আরোপিত কথায় কোন তোয়াক্কা করে না। কিন্তু পতিই যদি অসতী ভেবে বসে, তাহলে তার আর কোন আশা থাকে না, উৎকণ্ঠা থাকে না। জীবনেরও কোন তোয়াক্কা থাকে না। বদরু দেখল, শেষ কূলও তার ডুবে গেছে এবার আর তার ঠাঁই কোথায়? এবার ডুবে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি? তাছাড়া যদি সত্যিই মাথা নেড়া করে তাকে লোকের সামনে অপমান করে, তাহলে?

মরিয়া হয়ে বের হয়ে গেল ঘর হতে। তার মনে আজ কোন ভয় নেই। আজ যেন সে মুক্ত। তারপর অন্ধকারে কোথায় সে হারিয়ে গেল।

(২৫)

শামসুল যখন বাড়ি ফিরল, তখন তার মনে নানা প্রশ্ন। কেন মাষ্টার তার বাড়ি এল না। সে গেলে কেন তাকে বাড়িতে ডাকল না। হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন? চাচার কাছে কথা রাখতেই চাচা কাঁদতে লাগল। এবার সে বিয়াই-এর সমস্ত কথা খুলে বলল। শামসুল শিক্ষিত ছেলে। তার বাবাও পার্টি করে। পরদিন সকালে তাকে মোটর সাইকেলে চাপিয়ে থানায় নিয়ে গিয়ে বাবুর নামে অভিযোগ করে দিল। তার স্ত্রীর নামে বধূনির্যাতন কেস চাপিয়ে দিল।

আজ না গেলে মাষ্টার চলে যাবে বলায় পুলিশ সহ শামসুল ও সলীমুদ্দীন হাজির হল বদরুর ঘরে। তখন গোটা গ্রাম হুলুস্থুল। সবারই মুখে এক কথা বদরু অসতী, বদরু বেরিয়ে গেছে।

পুলিশ তদন্ত শুরু করল। বাড়িতে প্রবেশ করে বাবু ও তার বিবিকে উক্ত অভিযোগে গ্রেফতার করল। গ্রেফতার করল মাষ্টারকে। কিন্তু বদরু কই?

সবাই বলে বেরিয়ে গেছে। গেছে কোথায়?

মাষ্টার বলে, শামসুল তার বাড়িতে লুকিয়ে রেখে পুলিশ নিয়ে এসেছে।

শামসুল বলে, মিথ্যা কথা। সে এখানেই আছে। আর না হয় ওরাই ওকে খুন করে গায়েব করে দিয়েছে। ওরাই খুনী।

পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল। এ ঘর সে ঘর দেখতে দেখতে পরিশেষে দেখল, ধান ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সহজে খোলার চেষ্টা করেও পারা গেল না। পরিশেষে ভেঙ্গে প্রবেশ করতেই দেখা গেল, বদরু দীঘল ঘোমটা টেনে গলায় দড়ি নিয়ে সিলিং-এ ঝুলছে।

অবাক সবাই হতবাক! বদরু আত্মহত্যা করেছে! বদরু মারা গেছে। নাকি বদরুকে খুন করে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে!

বাইরে লোক জমা হয়েছিল। বাইরে থেকে খবর শুনে সকলেই ভিতরে প্রবেশ করে তার ঝুলন্ত দেহ দেখার চেষ্টা করল। পুলিশ সকলকে বাধা দিল। দারোগাবাবু লাশ নামাবার আদেশ দিলেন। ভিড় ঠেলে গরীব সলীমুদ্দীন বড়লোকের বাড়িতে প্রবেশ করল। কেঁদে কেঁদে বলল, "দারোগাবাবু! একটু সবুর করুন। ওর লাশ এখন নামাবেন না। আমার মেয়ে এ বাড়ির 'বিনা পণের বউ' ছিল। আমি পণ দিতে পারিনি দারোগাবাবু! আজ আমার মেয়ে নিজেই 'জীবন-পণ' দিয়ে সকলের কাছ হতে বিদায় নিল। একটু অপেক্ষা করুন

দারোগাবাবু! আমি ছুটে যাই ঐ পৃথিবীর মানুষের কাছে। সকলকেই ডেকে দেখিয়ে দিই, আমার মেয়ের এই ফাঁসি-পরা দেহকে।

ওগো পৃথিবীর মানুষ! ওগো উম্মতে মুহাম্মাদী! সবাই এস, এসে দেখে যাও আমার মেয়ের আত্মদান। দেখে যাও তার শুষ্ক ফুলের মত ঝুলন্ত দেহকে। ওগো! তোমরা এই গরীব-কন্যার করুণ অবস্থা দেখে জীবনে করুণা নিয়ে এস। মানুষের প্রতি দয়া কর, হে পৃথিবীর মানুষ! দুর্বলদের প্রতি এ অত্যাচার বন্ধ কর। আর সোচ্চার হও ঐ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে। রুখে দাঁড়াও ঐ বরপণ লোভী বর ও বরের বাবাদের বিরুদ্ধে। আমি জনগণের আদালতে আমার মেয়ের ফাঁসির বদলে ফাঁসির শাস্তি দাবী করছি। এস! ফাঁসি দিয়ে যাও আমার বদরুর খুনীকে। পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দাও ঐ লুটেরা ও খুনেরা 'পণপ্রথা'কে।

হে আল্লাহ! তুমি এ মানুষকে, এ জাতিকে সুমতি দাও।"

সমাপ্ত